আজও
চমৎকার
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আজও চমৎকার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

বাস থেকে নেমে বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে মনীশের মনে পড়লো যে দীপা চা কিনে আনতে বলেছিল। বৈঠকখানা বাজারে খোলা চা শস্তায় পাওয়া যায়, তার চেয়েও বড় কথা মনীশ সেখানকার একটা দোকান থেকে ধারে কিনতে পারে। মনীশের ভুলো মন। তাই দীপা একটা কাগজে চায়ের কথা লিখে সেটা পকেটে ভরে দিয়েছিল, সারাদিনে একবারও সেই কাগজটা দেখার কথাই মনে পড়েনি মনীশের।

এখন রাত সওয়া নটা, দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। ছোট এক প্যাকেট চা কিনে নিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই। কাল সকালের চা-টা কী হবে ? মনীশের নিজেরই চায়ের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, অথচ তার চা কেনার কথা মনে পড়ে না।

বৈঠকখানার দোকানটা আজ বন্ধ ছিল, দীপাকে এই কথাটা বললে কেমন হয় ? মনীশ আপন মনে হাসলো। ছেলেবেলার অভ্যেসগুলো ঝেড়ে ফেলা খুবই শক্ত। গতমাসে নিজের জন্মদিনটায় মনীশ প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে আর মিথ্যে কথা বলবে না, একমাত্র জীবন-মরণের সমস্যায় না পড়লে, তখন অবশ্য যে-কোনো অস্ত্রই ব্যবহার করতে হয়। স্ত্রীর কাছে এই সব ছোটখাটি মিথ্যেগুলো অবশ্য নির্দোষ, তাছাড়া যে-মিথ্যে প্রমাণিত হয় না, তা সত্যেরই সমতুল্য। মনীশ অনুচ্চ স্বরে দু'বার দু'রকমভাবে বললো, গিয়ে দেখি দোকানটা বন্ধ ! সঙ্গে পয়সাও বেশি নেই…জানো। আজ দোকানটা বন্ধ দেখলুম, পাশের দোকানে জিজ্ঞেস করলুম…

দু'একটা সাইকেল রিক্সা ছুটে যাচ্ছে ঝনঝন করে বেল বাজিয়ে। এ রাস্তায় আলো নেই। কোনো কোনো বাড়ির জানলাও এর মধ্যেই অন্ধকার। তের নম্বর বাড়ির একতলায় চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে যথারীতি, নতুন কেউ শুনলে ভাববে ঝগড়া-মারামারি চলছে বুঝি, আসলে ওখানে একটা নাটকের রিহার্সাল হয়। কাল সকালে বিছানায় শুয়েই কী করে চা পাওয়া যাবে, সেই চিন্তায় মনীশ এখনো উদ্বিগ্ন। এই সময়ে একটা সিগারেট টানার জন্য ঠোঁট শুলশুলোয়, কিন্তু প্যাকেটে দুটি মাত্র সিগারেট আছে, একটা রাত্রে ভাত খাবার পর, আর একটা কাল সকালে বাজারে যাওয়ার আগের জন্য বরাদ্দ।

একতলার ভাড়াটেরা বাড়ি বন্ধ করে কোথায় যেন বেড়াতে গেছে, মনীশ কড়া নাড়তেই দীপা দোতলা থেকে নেমে এসে দরজা খুলে দিল। তার মানে কুশ এখনো ফেরেনি। মনীশ ঘড়ি দেখলো। কুশ ইদানীং ফিরতে প্রায় বেশ দেরি করে। ও একটা টিউশনি করতে যায়, কিন্তু তা বলে এত রাত ? অবশ্য দু'বার

বাস বদলের ঝামেলা আছে।

দীপা প্রথমেই চায়ের কথা জিজ্ঞেস করলো না, দরজা খুলেই দ্রুত উঠে গেল, উনুনে রান্না চাপানো। মনীশ নিজের ঘরে এসে ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে একটা লুঙ্গি পরে নিল, বাথরুমে এসে দেখলো মাত্র এক বালতি জল ধরা আছে। এ সময় কলে জল থাকে না, ঐ জল নষ্ট করে স্নান করার প্রশ্ন নেই। হাত-মুখ চিটচিটে হয়ে আছে, এক মগ জল নিয়ে অতি সাবধানে খরচ করে মনীশ শরীরের অনেকখানি জায়গায় জল-ছাপ দিল।

জলের শব্দ পেয়েই রান্না ঘর থেকে দীপা বললো, এই, জল নষ্ট করবে না, হাত-মুখ ধুতে হবে!

মনীশ বেরিয়ে এসে রান্না ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললো, আর একটা বালতি খালি রয়েছে, ওতে জল তুলে রাখতে পারো নি!

—ওটা ফুটো হয়ে গেছে। নতুন বালতি কিনতে হবে।

কথাটা বলেই মুখ ফিরিয়ে দীপা এক ঝলক হাসলো।

দীপার এই এক বিরাট গুণ। অনটনের সময়েও তার মধ্যে কোনো তিক্ততা আসে না, ঘ্যানঘ্যানে সুরে অভিযোগ করে না সে কখনো। মাসের শেষ, এখন যে নতুন বালতি কেনার প্রশ্নই ওঠে না, সেটাই সে বুঝিয়ে দিল ঐ হাসি দিয়ে।

কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসেবে মনীশ এগিয়ে এসে দীপার ফর্সা ঘাড়ে ঠোঁট ছোঁয়ালো।

ডিমের ডালনা রাঁধছে দীপা। ডিম বেশি ভাজা হয়ে গেলে মনীশ পছন্দ করে না, তার চামড়া চামড়া লাগে, তাই দীপা খুব সতর্ক। সে মৃদু ধমক দিয়ে বললো, এই, কী করছো? সরে যাও, গায়ে তেল ছিটকে লাগবে।

মনীশ সে কথা শুনলো না, সে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলো দীপাকে। কুশ যতক্ষণ না ফেরে, ততক্ষণ ওরা দু'জনে অনেকটা স্বাধীন।

দীপা বললো, আঃ ছাড়ো! এসব না করে তুমি আমার কয়েকটা খাতা দেখে দাও না ততক্ষণ!

মনীশ বললো, ধুৎ! এখন কে খাতা দেখবে? সারা দিন খেটে খুটে এসে...

—শোনো, একটা ছেলে তোমাকে চার পাঁচবার খুঁজতে এসেছিল আজ!

—কে? নাম বলে নি?

—কী যেন একটা বলেছিল, মনে নেই। কী দরকার তা আমাকে বললো না, বললো, দাদার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—দাদা?

মনীশের কলেজ থেকে বাড়ি অনেক দূরে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দু'একজন কচিৎ কখনো বাড়িতে দেখা করতে আসে। কিন্তু তারা তো কেউ দাদা বলবে না।

দীপা বললো, মনে হলো গ্রামের ছেলে। গায়ের রঙটা কী রকম জানো, এত কালো যে নীল মনে হয়!

যদিও মনীশ লুঙ্গি পরা এবং লোমশ খালি গা, তবু সে ফরাসী কায়দায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে ইংরিজি ভাষায় বললো, ইউ মে ট্রাই টু ফরগেট ইয়োর ভিলেজ বাট দা ভিলেজ নেভার ফরগেটস ইউ! কোনো চিঠি-ফিঠি এনেছে?

—আমায় তো কিছু দেয় নি!

—ব্রজকাকা যদি আবার টাকা চায়, তা হলে তাকে এবার স্রেফ কাঁচকলা দেখাতে হবে। টাকা থাকলে তো দেবো!

—আরও টাকা বাকি আছে নাকি?

—কী জানি! ওদের তো চক্রবৃদ্ধি হারের হিসেব!

এরপরে দীপার বাকি রান্নার সময়টায় মনীশ পত্র-পত্রিকা পড়তে লাগলো শুয়ে শুয়ে। কখন লোড শেডিং হবে ঠিক নেই, এখন চমৎকার আলোময় সময়টা নষ্ট করা ঠিক নয়।

রবিবার ছাড়া খবরের কাগজ নেওয়া হয় না, অন্য দিনগুলোতে মনীশ কলেজে গিয়ে কাগজ পড়ে নেয়। পত্রিকাও কেনা হয় না একটাও, কিন্তু পাড়ার [illegible] সঙ্গে একটা ব্যবস্থা হয়েছে, ছ'টাকা চাঁদা দিলে ইংরিজি-বাংলা যে-কোনো সাময়িক পত্রিকা দু'দিনের জন্য এনে পড়া যায়। এই ভাবে মনীশ অনেকগুলো পত্রিকা পড়ে, সারা পৃথিবীর খবর রাখতে হবে তো তাকে। দীপারও খুব পড়ার ঝোঁক।

ঘরটি বেশি বড় নয় কিন্তু দক্ষিণ খোলা। দক্ষিণের জানলা দিয়ে পাশের একটা পুকুর দেখা যায়। রাত্রে সেখান দিয়ে প্রচুর মশা এলেও দিনের বেলা দৃশ্যটি সুন্দর। এক টুকরো প্রকৃতি। এদিককার ফাঁকা জায়গাগুলোতে অতি দ্রুত বাড়ি উঠছে, এই পুকুরও একদিন ভরাট হয়ে যাবে। কলকাতা শহর চারদিকে জিভ লকলকিয়ে মফঃস্বলকে গিলে নিচ্ছে।

এই ঘরটার জন্য একটা পাখা কিনতে হবে। এক এক সময় এমন গুমোট হয়, বিশেষত বর্ষাকালে, সারা গা তখন জ্বালা করে। রাত্তিরে মশারি না টাঙিয়ে উপায় নেই, ঘামে বিছানা ভিজে যায়। দীপারই কষ্ট হয় বেশি, মনীশের তবু অভ্যেস আছে। মনীশের এক সহকর্মী একটা হায়ার পারচেজের দোকানের সঙ্গে

আলাপ করিয়ে দেবে বলেছে, সামনের মাসেই একটা পাখা আনতে হবে। তারপর সেটার ধার শোধ হলে, কুশ-এর ঘরের জন্য আর একটা।

সংসারটা এখনো প্রায় নতুন, মাত্র দেড় বছরের। বিয়ের আগে মনীশ থাকতো আমহার্স্ট স্ট্রিটের এক মেসে। দীপাদের বাড়ি বরানগরে। দীপা তার বাপের বাড়ির কাছাকাছি থাকতে চায় না বলে মনীশ খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত বাড়ি ভাড়া করলো এই যাদবপুরে। এখনো অনেক কিছুই কিনতে হবে।

নিচের দরজায় আওয়াজ হচ্ছে। কুশ এসে গেছে, দীপার রান্নাও প্রায় শেষ। আমি খুলছি, বলে মনীশ খালি পায়ে নিচে নেমে গেল।

দরজা খুলে দেখলো, কুশ নয়, অন্য একটি অচেনা যুবক দাঁড়িয়ে। ধুতির ওপর সাদা হাফ শার্ট পরা, কাঁধে দুটো ঝোলা। দীপা এর কথাই বলেছিল, এর গায়ের রং প্রায় নীল, পায়ে টায়ার কাটা চটি, ধুতিটা বেশ ময়লা, বেশ পুরু ঠোঁট, সব মিলিয়ে গ্রাম-গ্রাম গন্ধ।

ছেলেটি মনীশের পায়ের ধুলো নিয়ে বললো, দাদা, আমি কলেজে চান্স পেয়েছি!

কলেজে ভর্তি হওয়া এখন একটা সমস্যা, তাই উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরুলেই অনেকে ধরাধরি করতে আসে। এই ছেলেটির জন্য মনীশকে কোনো চেষ্টা করতে হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। ভর্তি হওয়ার খবর দিতে এসেছে এত রাত্রে!

মনীশ বললো, বাঃ, ভালো কথা! কোথায় ভর্তি হলে?

ছেলেটি বললো, বঙ্গবাসী। দাদা, আমায় চিনতে পারছেন না, আমার নাম চাঁদু!

মনীশ ওর মুখ দেখে চিনতে পারেনি, নাম শুনেও কিছুই মনে পড়লো না। বই-এর পৃষ্ঠায় যা লেখা থাকে শুধু সেইসব মনে রাখার জন্যই যেন তার স্মৃতি তৈরি হয়েছে।

—তুমি কোথা থেকে আসছো?

—এখন? আমি আজ চার-পাঁচবার আপনার খোঁজ করেছি, যাদবপুর স্টেশনে বসেছিলাম এতক্ষণ।

—তোমার বাড়ি কোথায়?

—আমার বাড়ি তো সরবাদায়, আপনি আমায় দেখেছিলেন বহরমপুরে।

—ও, তা ভর্তি হয়েছো, খুশি হয়েছি। একদিন দেখা করো কলেজে।

ছেলেটির তবু চলে যাবার লক্ষণ নেই, এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মনীশের মুখের দিকে। বড় বড় দুটি চোখ, দ্বিধাহীন। মুখখানা চৌকো ধাঁচের। একটা ছেলে চার-পাঁচবার ঘুরে ঘুরে এসেছে কলেজে ভর্তি হবার খবর জানাতে?

—তুমি আর কিছু বলবে? অনেক রাত হলো, তোমাকে আবার বাড়ি ফিরতে হবে তো? এর পরে বাস পাবে না।

—দাদা, আমি কলেজে পড়বো, আমায় একটা থাকার জায়গার ব্যবস্থা করে দিতে হবে!

—তোমার থাকার জায়গা নেই কলকাতায়?

—না।

—তাহলে তুমি বহরমপুর কলেজে পড়লে না কেন? কলকাতায় মেসে-হস্টেলে জায়গা পাওয়া শক্ত।

—দাদা, আমার বহরমপুরেও কোথাও থাকার জায়গা নেই।

—তুমি কলকাতায় এসে উঠেছো কোথায়?

ছেলেটি চুপ করে গেল। এই নীরবতার একটাই অর্থ হয়। তার কাঁধে দুটো কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ, অর্থাৎ ওর মধ্যেই ওর যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি আছে বলে মনে হচ্ছে।

মনীশ এইসব বুঝেও বুঝতে চাইলো না। তাহলে দায়িত্ব নিতে হবে। খিদে পেয়ে গেছে তার, এখন কি এইসব ভালো লাগে! সে একটু বিরক্তভাবেই বললো, তুমি কি আমার ভরসাতেই এসেছো নাকি? কলকাতা শহরে হুট করে জায়গা দেওয়া যায়?

—দাদা, আপনি বলেছিলেন আমাকে সাহায্য করবেন।

—আমি বলেছিলাম? কবে? তোমায় তো আমি আগে দেখেছি বলেই মনে করতে পারছি না।

—বহরমপুরে, আপনার জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে।

মনীশ এক দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে চেয়ে রইলো। স্মৃতির মধ্যে আলোড়ন ঘটছে। কয়েকটা পর্দা সরে যাচ্ছে। বেশি দিন আগেকার কথা নয়, বছর পাঁচেক। সিউড়ি কলেজ ছেড়ে সেইবারই সে সিটি কলেজে চাকরিটা পায়। বহরমপুরে তার এক জ্যাঠা সিল্কের ব্যবসায় বেশ টাকা করেছেন, তাঁরই মেয়ের বিয়ের সময় গিয়েছিল মনীশ। ডিসেম্বর মাস, খুব শীত পড়েছিল সেবার মনে আছে। সেই বাড়িতে এক বুড়ি রান্না-বান্নার কাজ করতেন, গ্রাম থেকে আনা হয়েছিল তাঁকে, তিনি আবার দূর সম্পর্কের পিসিমা হতেন মনীশের, তাঁর নামই ছিল বুড়িপিসিমা। আত্মীয়তা থাকলেও সেই বুড়ি পিসিমার নিজস্ব কোনো ঘর

ছিল না, সারাদিন রান্নাঘরেই কাটিয়ে রাত্তিরটায় শুতেন একতলার বারান্দার এক কোণে।

বিয়ের রাতে দারুণ হৈ-হট্টগোল, মনীশের জ্যাঠামশাই নেমন্তন্ন করেছিলেন প্রায় শহরশুদ্ধু লোককে, মনীশের ওপর ভার দেওয়া হয়েছিল নিমন্ত্রিতদের পংক্তি ভোজনের সময় হাত জোড় করে হাসি হাসি মুখে বলা, সব নিয়েছেন তো ? আর কিছু লাগবে ? আর একখানা ফ্রাই দিতে বলি !

কী একটা কারণে মনীশকে একবার রান্নাঘরে ঢুকতে হয়েছিল। সেখানে একটা দৃশ্য দেখে সে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে যায়। ঘরের এক কোণে, প্রায় উনুনে ঠেস দিয়ে একটি তের-চোদ্দ বছরের ছেলে একখানা বই নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে দুলে দুলে পড়ছে।

মনীশ পড়াশুনোর লাইনের মানুষ। এমন দৃশ্যে তার ন্যায্য ভাবেই অভিভূত হবার কথা। যেন সে দ্বিতীয় এক বিদ্যাসাগরকে দেখছে।

সে জিজ্ঞেস করেছিল, কী রে, তুই এখানে কী করছিস ?

ছেলেটি ভয়ার্ত কাচু-মাচু গলায় বলেছিল, তার ক্লাস এইটের অ্যানুয়াল পরীক্ষা চলছে, পরের দিনই তার হিস্ট্রি পরীক্ষা। হিস্ট্রির সাল-তারিখগুলো তার ভালো মুখস্থ থাকে না, দু'একদিন না পড়লেই ভুলে যায়, সেইজন্যই সে....।

ছেলেটির নাম চন্দ্রনাথ, সে বুড়ি পিসিমার একমাত্র সন্তান।

তখনই মনীশ বুঝতে পেরেছিল বুড়ি পিসিমা আসলে ততটা বুড়ি নন, তা হলে তাঁর চোদ্দ বছরের ছেলে থাকে কী করে ? বুড়ি তাঁর ডাকনাম, বিধবা অবস্থায় পরের বাড়িতে রাঁধুনিগিরি করতে এসে বুড়ির মতন সেজে থাকাটাই তিনি উচিত মনে করেছিলেন।

বাইরে সানাই বাজছিল, উঠোনে খাওয়ার আসরে বরযাত্রীদের অসভ্য হল্লোড়, বড় বড় কড়াইতে ভাড়াটে বামুন ঠাকুররা লুচি ভেজে যাচ্ছে, তারই মাঝখানে একজন বিদ্যাসাগর।

পরদিন মনীশ বুড়িপিসিমাকে বলেছিল, তোমার ছেলেকে তুমি পড়াও, কোনোক্রমেই যেন পড়াশুনো বন্ধ না করে। আমার কাছ থেকে কোনো সাহায্যের দরকার হলে বলো। বই-পত্তর বা অন্য যে-কোনো রকম সাহায্য...।

আবেগের বশে মনীশ মিথ্যে আশ্বাস দেয় নি। তখন সে অবিবাহিত, পকেটে মাঝে মাঝে স্বাধীন টাকা থাকে, মাথায় বেশ খানিকটা আদর্শের বাষ্পও ছিল। এক গরিব অনাথার সন্তানকে সে সাহায্য করতে রাজি ছিল ঠিকই। কিন্তু তার কাছে সাহায্যের কোনো আবেদন আসে নি। বরং মাস কয়েক বাদে বহরমপুরের

এক জ্যাঠতুতো ভাইয়ের সঙ্গে শিয়ালদায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে মনীশ নিজেই খোঁজ নিয়েছিল চন্দ্রনাথ সম্পর্কে। জানা গেল যে চন্দ্রনাথ দু'সাবজেক্টে ফেল করেছে, প্রমোশান পায় নি। এবং তার মা নাকি তিন তিনবার অতি লালসাসিক্ত দোষ করেও ক্ষমা পেয়ে চাকরিতে টিকে আছে।

এরপর যদি মনীশ চন্দ্রনাথ-বুড়ি পিসিমা সম্পৃক্ত ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মন থেকে মুছে ফেলে, তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। এ যুগে রাস্তার আলোতে বা রান্নাঘরে বসে যারা পড়ে তারা অধিকাংশ ফেলই করে, তাদের মধ্য থেকে বিদ্যাসাগর হয় না কেউ !

ওপরের বারান্দা থেকে দীপা উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করলো, এই, তোমার কী হলো ? কে এসেছে ?

মনীশ বললো, আসছি !

তারপর চাঁদুকে বললো, আজ রাত্তিরেও তুই কোথাও থাকতে পারবি না ? আমার বাড়িতে যে জায়গা নেই।

চাঁদু বললো, তাহলে যাদবপুর রেল স্টেশনে...

—খাওয়া-দাওয়াও হয়নি নিশ্চয়ই ? ওপরে আয় !

দুটি ঘর ছাড়া আর প্রায় এক চিলতেও জায়গা নেই, ঐ সিঁড়ির ধারের ছোট বারান্দাটা ছাড়া। বাথরুম, রান্নাঘরে যাবার জন্য একটা অতি সরু প্যাসেজ।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মনীশের মনটা ক্রমশ নিরস হয়ে এলো। একটা ছেলে আশ্রয় চাইতে এসেছে, তাকে সে তাড়িয়ে দিতে পারবে না ঠিকই, কিন্তু লেখাপড়া সম্পর্কে তার মনোভাব বদলে গেছে। বছরের পর বছর ছাত্র ঠেঙিয়ে তার মনে হয়, এইসব কলেজগুলোতে শুধু গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাবার পণ্ডশ্রম করে যাওয়া হচ্ছে। একশো জনের মধ্যে পাঁচ-সাতজন ছাড়া বাকিরা জানেই না যে কেন তারা পড়াশুনো করতে এসেছে। মফঃস্বলের স্কুল থেকে যারা পাস করে আসে তাদের অধিকাংশই একেবারে নিরেট। এমন এমন প্রশ্ন করে যা শুনে তাজ্জব হয়ে ভাবতে হয়, কী করে এরা হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করলো ! এদের বি-এ, এম-এ পাশ করিয়েই বা লাভটা কি ? চাকরির বাজারে হায়ার সেকেণ্ডারি আর সাধারণ বি এ, এম এ-র একই দাম। শুধু শুধু কয়েকটা বছর নষ্ট করা কেন ? তাছাড়া, চাকরি দিচ্ছেই বা কে ? চাকরি জিনিসটা এখন ভূতের মতন, অনেক গল্প শোনা যায়, চোখে দেখা যায় না।

মনীশের এক সহকর্মী প্রদীপ সরকার অবশ্য বলে, আরে, এই মফঃস্বলের ছাত্ররাই তো আমাদের লক্ষ্মী। ওদের তোয়াজ করতে হয়। এরা ডাক্তারি

ইঞ্জিনিয়ারিং বা কোনো সায়েন্স সাবজেক্টে ভর্তি হবার চান্স পায় না বলেই তো আর্টস বা কমার্স পড়তে আসে। ওরা যদি কলেজে পড়া বন্ধ করে দেয়, তাহলে আমাদের এইসব কলেজ তো উঠে যাবে! তখন আমরা খাবো কী?

মনীশ চাঁদুকে বারান্দায় দাঁড়াতে বলে দীপাকে ডেকে নিয়ে গেল শোওয়ার ঘরে। ফিসফিস করে বললো, আমার এক পিসতুতো ভাই এসেছে, আজকের রাত্তিরটা থাকতে চায়, এমনিতে ছেলে খুব ভালো, খুব নম্র আর ভদ্র...কী করা যায় বলো তো?

এক মুহূর্ত চিন্তা না করে দীপা বললো, রাত্তিরে খাবে তো? যাঃ, দুটো মোটে ডিম রান্না করেছি, আর যে ডিম নেই!

দীপার চরিত্র এখনো ঠিক মতন বুঝতে পারে না মনীশ। দীপাকে বোঝাবার জন্য অনেক যুক্তি তৈরি করতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু দীপা কোনো সুযোগই দিল না, তার আগেই মীমাংসা হয়ে গেল।

মনীশ বললো, বারান্দায় তো শুতে দেওয়া যাবে না, যদি বৃষ্টি পড়ে।

দীপা বললো, খোলা বারান্দায় কারুকে শুতে দেওয়া যায় নাকি? কুশের ঘরেই শোবে।

—কুশ যদি আপত্তি করে?

—একটা তো মোটে রাত। কুশকে বুঝিয়ে বললেই হবে। তোমার কোনো পিসিমা আছেন, শুনিনি তো আগে?

—আপন নয়, খানিকটা দূর সম্পর্কের। আমায় খুব ভালোবাসতেন। চাঁদু ছেলেটাও খুব ভালো, পড়াশুনোর দিকে আগ্রহ সেই ছোটবেলা থেকে।

কেন যে মুখে মিথ্যে কথা এসে যাচ্ছে তা মনীশ নিজেই বুঝতে পারছে না। প্রতিজ্ঞা রাখতে পারছে না সে। অথচ অকারণ।

দীপা বললো, ওকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখলে কেন? কুশের ঘরে বসতে বলো। জামা-কাপড় ছাড়ুক।

দু'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে আসবার পর মনীশ বললো, চাঁদু, ভেতরে আয়, উনি তোর বৌদি।

চাঁদু আড়ষ্ট ভাবে তাকালো দীপার দিকে। যে-কোনো কারণেই হোক সে মেয়েদের ভয় পায়। দিনের বেলা কয়েকবার এসেও সে দীপার কাছে নিজের পরিচয় দেয় নি।

এবারে সে টিপ করে দীপাকে প্রণাম করতে যেতেই দীপা দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বললো, আরে থাক থাক। ইস, ঘামে তোমার জামাটা ভিজে গেছে একদম, আজ

বড্ড গরম। তুমি ওদের গ্রাম বাড়িটিতেই থাকো বুঝি?

চাঁদু বললো, আজ্ঞে না। আমাদের গ্রাম হলো সরবাদা।

সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বোঝাবার জন্য মনীশ আন্তরিক সুরে জিজ্ঞেস করলো, পিসিমা কেমন আছেন রে? অনেকদিন দেখিনি।

চাঁদু বললো, মা মারা গেছে। তিন বছর হয়ে গেল প্রায়।

উত্তরটা শুনে দীপা তাকালো মনীশের দিকে। চাপা ভাবে হাসলো। দূর-সম্পর্কের পিসিমা জাতীয় কারুর নিয়মিত খবর রাখা যে মনীশের ধাতে নেই তা সে বোঝে। মনীশ সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। আমেরিকার রেগন আর রাশিয়ায় গরবাচেভ জানেন না যে তাঁদের কতবড় একজন সমালোচক রয়েছে এই যাদবপুরের দু'খানা ঘরের এক ছোট্ট ফ্ল্যাটে।

মনীশ জিজ্ঞেস করলো, তুই তাহলে বহরমপুর থেকেই পরীক্ষা দিয়েছিস?

—আজ্ঞে না। মায়ের মৃত্যুর পর গ্রামে চলে গিয়েছিলাম। বড়মামা অবশ্য বলেছিলেন ওঁর দোকানে কাজ করতে।

এত সব গূঢ় কথা এক্ষুনি বলবার দরকার কী, মনীশ ভাবলো। চাঁদুর বড়মামা মানে মনীশের সেই জ্যাঠামশাই। অতি ধুরন্দর লোক। চাঁদুকে তিনি তার দোকানের চাকর রাখতে চেয়েছিলেন। চাঁদুর মা কী ভাবে মারা গেছেন সে কথা জানতে চাইলে আবার কী বেরিয়ে পড়বে কে জানে!

কথা ঘোরাবার জন্য মনীশ বললো, কুশটা তো এখনো এলো না। আমার কিন্তু খুব খিদে পেয়ে গেছে। তুমি খাবার দিয়ে দাও, দীপা। তার মধ্যেই কুশ এসে পড়বে।

দু'মাস আগেও রান্না ঘরের ছোট্ট পরিসরে পিঁড়ি পেতে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তারপর মনীশ একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কুশের পড়াশুনোর জন্য কেরোসিন কাঠের একটা টেবিল কেনা হয়েছিল রথের মেলা থেকে। প্রথমে একখানা চেয়ার ছিল, মনীশ আরও দুটি চেয়ার কিনে আনে, তারপর সে প্রস্তাব দেয়, ঐ টেবিলেই খাওয়া হবে। কুশই অবাক হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। এই সংসার পাতা হবার পর সে এসেছে গ্রাম থেকে। এখনো সে এঁটো কাঁটা মানে। টেবিলে বসে খাওয়া সে ঠিক মন থেকে বরদাস্ত করতে পারে না। দীপা এক টুকরো অয়েল ক্লথ জোগাড় করে বলেছিল, এতে সকরি হয় না।

অয়েল ক্লথ চটপট মুছে ফেলাও সুবিধের। তারপর থেকে টেবিল থেকে বইপত্র সরিয়ে ঐ অয়েল ক্লথ পেতেই খাওয়া হয় রাত্তিরবেলা। দিনের বেলা তিন জন আলাদা আলাদা সময়ে খায়, তখন রান্না ঘরে পিঁড়ি পেতেই কাজ চলে

যায়।

চাঁদু কোথাও বসে নি এপর্যন্ত, দাঁড়িয়েই আছে। তাকে বসতে বললেও সে বসে না। দীপা খাবার বেড়ে দেবার পর সে কুণ্ঠিত ভাবে বললো, বৌদি, আমি নিচে বসেই খাবো!

মনীশের এরকম ব্যবহার পছন্দ হয় না। সে গ্রাম-জীবন থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। চাঁদুর এরকম ব্যবহারের অর্থই হলো, সে যে মনীশের আসল আত্মীয় নয়, সেটা প্রকট করে দেওয়া।

সে ধমক দিয়ে বললো, ধ্যাৎ! মাটিতে আবার কী, এই চেয়ারে এসে বোস! এটা কলকাতা শহর, মনে রাখিস!

দু'তিনবার বলার পর চাঁদু আধখানা চেয়ারে এমনভাবে পেছন ঠেকিয়ে বসলো, যে-ভঙ্গির মধ্যে একটা হীনমন্যতা আছে। যেন সে চেয়ারে বসার অনধিকারী। মনীশ আবার একটি ধমক দিল তাকে।

দুটি ডিম নিখুঁত ভাবে চার খণ্ড করেছে দীপা। এছাড়া ভাত-ডাল-পেঁপের তরকারি। প্রথম থালার ভাত শুধু ডাল দিয়েই খেয়ে ফেললো চাঁদু। বোধহয় সারা দিন তার খাওয়া হয়নি। ডেকচিটা নিয়ে এসে দীপা নরম করে বলে, এই নাও, আর একটু ভাত নাও। হাতার পর হাতা সে ভাত তুলে যায়, চাঁদু থামতে বলে না, মনীশের সঙ্গে কথা বলায় সে অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। ডেকচি প্রায় খালি করে চাঁদুর থালাটা ভরে দেয় দীপা। তারপর চকিতে একবার স্বামীর দিকে তাকায়।

কুশ এখনো ফিরলো না। সে যত দেরি করে ফেরে ততই ভালো। এক্ষুনি আর একবার ভাত চাপাতে হবে।

॥ ২ ॥

প্রায় প্রত্যেকদিনই মনীশের ঘুম ভাঙার আগে দীপা বিছানা ছেড়ে উঠে যায়। মনীশ একটুক্ষণ সারা বিছানায় গড়াগড়ি করে, তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে নিজের বুকে হাত বুলোয়। যেন দীপাকে না পেয়ে নিজেকেই আদর করছে।

আসলে এই সময়টায় তার বুকে একটা চিনচিনে ব্যথা হয়। কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। গ্যাসের চাপ। কিছুদিন আগেও তার এই উপসর্গ ছিল না। বুকে হাত ঘষে ঘষে সে ব্যথাটাকে তাড়িয়ে দিতে চায়।

শুয়ে শুয়ে প্রথম কাপ চা না খেলে উঠতে ইচ্ছে করে না। কাল রাতে চায়ের প্রসঙ্গটা আর ওঠে নি। সকালের চা কী করে আসবে কে জানে। দীপার মর্নিং

স্কুল, সে সাড়ে ছ'টার মধ্যে বেরিয়ে যাবে। তারই মধ্যে সে অনেক কাজ সারে।

রান্না ঘরে টুং-টাং শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সকালবেলার জল-তরঙ্গ। চায়ের কাপে চামচ ছাড়া এমন মিষ্টি আওয়াজ আর কিছুতে পাওয়া যায় না। দীপা ম্যাজিক জানে নাকি!

চায়ের কাপটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে মনীশ কোনো প্রশ্ন করলো না। এর মধ্যেই দীপার স্নান হয়ে গেছে। একটা টুলের ওপর বসে পড়ে সে জিজ্ঞেস করলো, তোমার টাকা লাগবে?

প্রত্যেকবার এই প্রশ্নটি শুনে মনীশ চমকে ওঠে। দীপা ঠিক দিনটায় কী করে বুঝতে পারে?

দীপা মনীশের চেয়ে বেশি রোজগার করে না। এই সংসার চলে প্রধানত মনীশেরই টাকায়। তবু মাসের শেষ দিকটায় মনীশ দিশে হারিয়ে ফেলে আর দীপা কোথা থেকে যেন নিজস্ব গোপন টাকা বার করে দেয়। যেন তার প্রচুর ব্ল্যাক মানি।

একটা কুড়ি টাকার নোট মনীশের হাতে দিয়ে দীপা আবার জিজ্ঞেস করলো, ঐ চাঁদু কি এখানেই থাকবে?

ধড়মড় করে উঠে বসে মনীশ বললো, না, না, না, না, এখানে কী করে থাকবে? নিজেদেরই জায়গা হয় না। ওকে অন্য জায়গায় ব্যবস্থা করতে হবে।

—ও তো ভোরবেলাই উঠে বসে আছে। আমার সঙ্গে অনেক কথা হলো। তুমি সুধীর হালদার বলে কারুকে চেনো?

—না তো, কে সে?

—ওদের গ্রামের স্কুলের সেক্রেটারি। ভালো মানুষ বলে মনে হয়। চাঁদু উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে বলে তিনি ওকে তিনশো টাকা দিয়েছেন। সেই টাকা নিয়ে চাঁদু কলকাতায় এসেছে কলেজে পড়তে।

—কলেজে পড়লেই হলো? থাকার জায়গার কোনো ঠিক নেই!

—সুধীর হালদার তাঁর একজন চেনা লোকের কাছে চিঠি লিখে দিয়েছেন চাঁদুকে। চাঁদু কাল বড়বাজারে গিয়ে সেই ঠিকানা খুঁজে পায়নি।

—ঠিকানা খুঁজে পায়নি, না লোকটিকে পায়নি?

—রাস্তাটাই খুঁজে পায়নি।

—ওঃ, তাতে আর কী, বড়বাজারের দিকে অনেক গলি-ঘুঁজি, আজ সকাল-সকাল গিয়ে খুঁজবে। পেয়ে যাবে ঠিক!

—যদি লোকটিকে না পায়?

—তাহলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। ও তো আমার ভরসায় কলকাতায় আসেনি!

—তোমার ভরসাতেই এসেছে। তুমি ওর হীরো। ওদিকের অনেকগুলো গ্রামের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে বিদ্বান। গ্রামের লোক বোধহয় ভাবে কলকাতায় তোমার মস্ত বড় বাড়ি!

হাত ঘড়ি দেখে চমকে দাঁড়িয়ে উঠে দীপা বললো, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি চলি! পাঁউরুটি আছে সেঁকে নিও। আর শোনো, আজ বাজারে গিয়ে মাছ-টাছ আনতে হবে না। বরং পাঁচ কিলো চাল কিনে নিয়ে এসো!

দিনের প্রথম সিগারেটটা মনীশ মৌজ করে ধরালো। সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনবার কাশি হয়। একটু হাঁপ ধরে।

মনীশ নিজেও একখানা চিঠি নিয়ে কলকাতার কলেজে পড়তে এসেছিল। ডিষ্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছিল বটে সে, কিন্তু কলেজ ছিল তার গ্রাম থেকে অনেক দূরে, তার বাবা বলেছিলেন সেখানকার হোস্টেলের খরচ চালাতে পারবেন না। হেডমাস্টার মশাই-এর কাছ থেকে ভবানীপুরের শ্রীপতি মণ্ডলের নামে একটি চিঠি নিয়ে মনীশ বুক ঠুকে চলে এসেছিল কলকাতায়। বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াবার বদলে শ্রীপতিবাবু থাকতে দিয়েছিলেন, হাত-খরচও দিতেন কিছু কিছু। শ্রীপতিবাবু দয়া না করলে মনীশের জীবন অন্যরকম হয়ে যেত।

কিন্তু শ্রীপতিবাবুর মস্ত বড় কাপড়ের দোকান, তিনি ধনী। মনীশের তো সে সামর্থ্য নেই। ছোট ভাইটার পড়ার খরচ চালাতে হচ্ছে। বাড়ি-ভাড়া আর যাতায়াত খরচেই সব পয়সা হুস করে বেরিয়ে যায়। ছাত্রবয়েস থেকেই শখ ছিল অধ্যাপনা করার। ডব্লু বি সি এস পরীক্ষা দেওয়া কিংবা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরির সে কোনো চেষ্টাই করেনি। এম এ-র রেজাল্ট বেরুবার পরেই মফঃস্বল কলেজে চাকরি পেয়ে বর্তে গিয়েছিল সে।

বাথরুম থেকে ফিরে মনীশ দেখলো চাঁদু একটা খাতা খুলে কী সব লিখছে, কুশ ঘুমোচ্ছে এখনও। ডাকাডাকি না করলে কুশ ওঠে না। পড়াশুনোতে বিশেষ মন নেই।

—কী লিখছিস, চাঁদু?

—একটা চিঠি, গ্রামের একজনকে।

—তুই চা খেয়েছিস?

—আমি তো চা খাই না, দাদা।

—ভালো, তাহলে আর ও অভ্যেসটা করিস না, শুধু শুধু খরচের ধাক্কা। আমি বাজার থেকে ঘুরে আসছি, তুই কুশকে ডেকে তোল।

মনীশ লুঙ্গি পরে বাজারে যেতে পারে না। যেখানে সেখানে ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। দাড়ি-গোঁফ কামানো ভারিক্কি চেহারার লোকেরাও কাছে এসে ছাত্র বলে পরিচয় দেয়।

ধুতি-পাঞ্জাবি পরে চুল আঁচড়াতে হয়, দাড়ি কামানোটা বাকি থাকে। আগে মনীশ বাঁধা নাপিতের কাছে রোজ দাড়ি কামাতো, এখন খরচ বাঁচাবার জন্য সরঞ্জাম কিনেছে। খুবই বিচ্ছিরি লাগে তার এই প্রতিদিন দাড়ি কামাবার ব্যাপারটা। রাস্তায় যেসব যুবকের মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি দেখে, তাদের মনে মনে ঈর্ষা করে মনীশ। একবার সে দিনচারেক ছুটির পর দাড়ি না কামিয়ে কলেজে গিয়েছিল, তাতে তার ডিপার্টমেন্টাল হেড শ্লেষের সঙ্গে বলেছিলেন, কী হে, মনীশ, নকশাল হলে নাকি? অথচ, কমার্সের অবনীবাবুর মুখে চাপদাড়ি, তাতে কারুর কোনো আপত্তি নেই। চাপদাড়ি তো আর একদিনে গজায় না, প্রথম প্রথম তো খোঁচা খোঁচা দাড়ি থাকবেই।

বাজার করাটাও মনীশের পছন্দ নয়। কিন্তু কুশের ওপর এই ভার দেওয়া যায় না। গ্রামের ছেলে হয়েও কুশ পচা মাছ বা বুড়ো ঢ্যাঁড়শ চেনে না। পয়সাও খরচ করে এলোমেলো।

দীপা মাছ কিনতে বারণ করেছিল, তবু মনীশ আড়াই শো কুচো চিংড়ি কিনে ফেললো। একটু আঁশটে গন্ধ না থাকলে মনীশের ভাত রোচে না। তাছাড়া অনেকদিন পর আজ কুচো চিংড়ি বারো টাকায় নেমেছে।

এক পশলা বৃষ্টি নামায় মনীশ আটকে গেল খানিকক্ষণ। বাড়ি ফিরে দেখলো, রান্নাঘরে চাঁদু মুসুর ডালে সম্বার দিচ্ছে আর পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে কুশ।

চট করে সিগারেটটা লুকিয়ে ফেলে চোখ বড় বড় করে কুশ বললো, দাদা, এ ভালো রান্না করে। এখন থেকে সকালে চাঁদুই রাঁধতে পারবে।

কুশ নিজের কাঁধ থেকে দায়িত্বটা সরিয়ে দিতে চাইছে। মনীশ চোখ দিয়ে ছোট ভাইকে নিষেধ করতে চাইলো। চাঁদুর মা পরের বাড়িতে রাঁধুনীর কাজ করতো, সে নিজেও খানিকটা রান্না জানবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে? কিন্তু সেই কারণেই ওকে বাড়িতে রাখা যায় না। একটা জোয়ান ছেলের খাই-খোরাকির খরচ কম নাকি?

মনীশ বললো, কুশ, তুই তো আজ চাঁদুর সঙ্গে গেলে পারিস। ও বড়বাজারের একটা ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছে না।

—আমার যে বারোটার সময় ক্লাস আছে।

—তার আগেই চলে যা। খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে পড়।

দীপা ফেরে এগারোটার একটু পরে, অধিকাংশ দিনই তার আগে মনীশ বেরিয়ে যায়। সকালের খাওয়াটা সারতে হয় যেমন-তেমন করে। আজ অবশ্য খাওয়াটা বেশ ভালোই হলো। ডাল, আলু সেদ্ধ, পটল ভাজা, কুচো চিংড়ির ঝোল। সুন্দর স্বাদ, পাকা হাতের রান্না, সব ক'টাই চাঁদু রেঁধেছে।

বড়রাস্তার মোড়ের সিগারেটের দোকানটায় ধার জমে গেছে বেশ কিছু টাকা। এবারে শোধ না দিলে আর নয়। গতবছর খাতা দেখার টাকাটা এখনো পাওয়া যায়নি, সেকথা কি ও বুঝবে? এখন প্রত্যেকদিন হাত বাড়াবার সময় আশঙ্কা হয়, যদি দোকানদার বলে যে আর ধার হবে না!

পাখাটা কিনতেই হবে। দীপার কষ্ট হয় খুব, যদিও মুখে তা স্বীকার করে না। পাখাবিহীন ঘরে শোওয়ার অভ্যেস তো কোনোদিন ছিল না দীপার। দীপা শহরের মেয়ে, তাদের বাড়ির অবস্থা বেশ সচ্ছল। বিয়ের পর একদিনও শ্বশুরবাড়ি যায়নি মনীশ, কিন্তু আগে তো দীপাদের বাড়ি সে বহুবার দেখেছে। প্রেম যুক্তিহীন কিন্তু বিয়ের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দিয়ে দীপাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল মনীশ। দীপা কিছু মানতে চায়নি। মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছে, আমি ভালোবাসাকে দাঁড়ি-পাল্লায় চাপাতে চাই না, ব্যাস! তুমি বিয়ে করতে ভয় পাচ্ছো কি না বলো!

দীপার এক মামা একই সঙ্গে ভয় আর লোভ দেখিয়েছিলেন। চালচুলোহীন এক কলেজের মাস্টারকে পছন্দ না হওয়াটাই স্বাভাবিক। গ্রামেও মনীশদের বিশেষ কিছু সম্পত্তি ছিল না, তার বাবা মামলা করেই সব উড়িয়েছেন। তাছাড়া, দীপাদের পদবী মুখোপাধ্যায় আর মনীশের পদবী দাস।

দীপার মামা বলেছিলেন, মনীশ যদি জোর করে দীপাকে বিয়ে করে, তাহলে তিনি তার চাকরি খেয়ে দেবেন। সে ক্ষমতা তাঁর আছে। আর মনীশ যদি দীপার ওপর সব দাবি ছেড়ে দিতে রাজি হয়, তাহলে তিনি বোম্বাইতে মনীশকে ভালো চাকরি পাইয়ে দেবেন, তিনি নিজেই সে-রকম একটি কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন।

মনীশকে বেশি সাহস দেখাতে হয়নি, সব কিছুই করেছে দীপা। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসেই সে ছোট্ট একটা সুটকেস নিয়ে এসেছিল, আর ফিরে যায়নি বাড়িতে।

দীপার মামা অবশ্য তাঁর হুমকিটা কাজে পরিণত করতে পারেননি। আজকাল

কোনো চাকরি থেকেই কারুকে সরানো সহজ কথা নয়।

মনীশের কোনো জমানো টাকা ছিল না, দীপাও সঙ্গে কিছু নিয়ে আসেনি। নতুন সংসার পাতার সময় অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোও কিনতে হয়েছে মাইনের টাকা দিয়ে।

এরই মধ্যে মনীশের বাবা মারা গেলেন। ছেলে কলকাতায় চাকরি করে, তার ওপর বামুনের মেয়ে বিয়ে করেছে, এই নিয়ে তিনি গর্ব করে বেড়াতেন এবং প্রচুর ধার করতেন। সেই ধার মনীশকে এখনো শোধ করতে হয়।

মনীশের এক দিদি আছে, তার বিয়ে হয়েছে বর্ধমানে। মনীশের দিদি বাংলা পড়তে পারলেও ইংরিজি জানে না একবর্ণও। জামাইবাবু পড়েছেন ক্লাস নাইন পর্যন্ত, তিনি একটি ছোটখাটো জোতদার। আর মনীশ এম এ পরীক্ষায় ইংরিজিতে সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট, পারিবারিক পরিবেশ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে সে। সে এখন বিশ্ব সাহিত্য ও বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামায়। তবু সে মাঝে মাঝেই বলে ওঠে, আমি নিজে গ্রামকে ছাড়তে চাইলেও গ্রাম আমায় ছাড়বে না।

বাবার মৃত্যুর পর তার ছোট ভাই কুশ আশ্রয় নিয়েছিল দিদির বাড়িতে। সেখানে খাওয়া-পরার অসুবিধে ছিল না। কিন্তু ছ'মাস বাদেই জামাইবাবু জানালেন যে কুশ লেখাপড়া কিছুই করে না, বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশছে, এ রকম ভাবে চললে সে একেবারে বখে যাবে। মনীশের উচিত তাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কলেজে পড়ানো।

মনীশের তাতে ঘোর আপত্তি ছিল। নতুন সংসারে সে আর দীপা তখন কপোত-কপোতী। দরজাটা বন্ধ করলেই সারা পৃথিবী তুচ্ছ। যতই টাকা পয়সার টানাটানি থাক, তবু তীব্র আনন্দ। এর মধ্যে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি একটা সাংঘাতিক নিষ্ঠুরতা।

তাছাড়া, মনীশ বুঝেছিল, কুশের বিশেষ লেখাপড়া হবে না। তার পরের দুই যমজ ভাইয়ের মধ্যে একজন তার মায়ের সঙ্গেই মারা যায়। অল্প বয়েস থেকেই বেশি প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে কুশের মাথাটা বিগড়ে গেছে। জেদী আর একগুঁয়ে। লেখাপড়ার দিকে তার ঝোঁক নেই। শুধু শুধু জোর করে তাকে কলেজে পড়িয়ে কী হবে? তার বদলে জামাইবাবুর ওখানেই তাকে চাষের কাজে কর্মে জুড়ে দেওয়া ভালো।

সকলে ভাবলো, এটা মনীশের স্বার্থপরতা। সে ছোট ভাইয়ের দায়িত্ব নিতে চায় না। সে নিজে এত লেখাপড়া শিখেছে, অথচ সে ছোট ভাইকে মানুষ করতে

চায় না ?

মাস দুয়েক আগে দিদি-জামাইবাবু কুশকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন একদিন। দীপা তাঁদের খাতির-যত্নের ত্রুটি করে নি।

দিদি-জামাইবাবু রোমহর্ষক ভাষায় বর্ণনা করলেন তাঁদের মহকুমার পরিস্থিতির। সেখানে মারামারি খুনোখুনি চলছে অবিরাম। কুশ উগ্র রাজনৈতিক দলের ছেলেদের সঙ্গে ভিড়েছে, এবং এর মধ্যেই সে অংশ নিয়েছে দু-একটা ঘর-বাড়ি পোড়ানোর ঘটনায়, গত সপ্তাহে হাটবারে কুশের দল অন্য পক্ষকে মারপিট করেছে প্রচণ্ড। গ্রামে রাখলে কুশকে বাঁচানো যাবে না, দিদি-জামাইবাবুরাও বিপদে পড়বেন।

দীপা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল, তাহলে কুশ এখানেই থাক।

মনীশ তবু খানিকটা চেষ্টা করেছিল কুশকে বহরমপুরে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে রাখা যায় কি না। কিন্তু সে-চেষ্টাও নিষ্ফল হয়েছে। তিনি আপন জ্যাঠামশাই নন, খানিকটা আত্মীয়তা থাকলেও স্নেহ-মমতার টান নেই।

কুশ আসার ফলে দীপার সঙ্গে মনীশের নিভৃত জগৎটা যে অনেকখানি অন্তর্হিত হয়েছে শুধু তাই-ই নয়, খরচও অনেক বেড়েছে।

এর পরে আবার চাঁদুর উদয়। এই রকম চলতে থাকলে তো গ্রামের যে-কোনো হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ ছেলেই কলকাতায় এসে বলবে, মনীশদা, আমি তোমার বাড়িতে থাকতে চাই। যেন হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেই তারা মনীশকে ধন্য করে দিয়েছে। না, না, না, চাঁদুকে ঐ বড়বাজারেই জায়গা খুঁজে নিতে হবে।

কলেজের চাকরি নেবার পর মনীশ ঠিক করেছিল সে কোনোদিন টিউশানি বা কোচিং ক্লাশ ইত্যাদিতে নিজেকে জড়াবে না। তার অনেকখানি ফাঁকা সময় চাই। নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়তে সে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায়। প্রচণ্ড খিদের মতন তার বই পড়ার নেশা। সাধারণ একটা গ্রাম্য পরিবারের ছেলে, বাড়িতে আর কারুর এই নেশা ছিল না, তবু তার যে অল্প বয়েস থেকেই কী করে এই নেশাটা ধরলো তা কে জানে। এখনো সে-বইয়ের দোকানের সামনে গেলে লোভ সামলাতে পারে না, সংসারের জরুরি টাকা ভেঙে বই কিনে ফেলে। না কিনে লাইব্রেরি থেকে এনেও যে সেই বই পড়া যায়, সেই মুহূর্তে তা মনে থাকে না।

প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেনি মনীশ, তাকে দুটো টিউশানি নিতে হয়েছে। তার আর দীপার মাইনের টাকায় একটা ছোট সংসার চলে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু

ধার, ধার শোধ করতে হচ্ছে যে নিয়মিত। দীপার স্কুলের চাকরিটিও পাকা নয়। এখানো লীভ ভ্যাকেন্সিতে আছে, মাত্র চার শো টাকা পায়। কুশ এসে পড়বার পর মনীশের টিউশানি না নিয়ে উপায় ছিল না।

সপ্তাহে তিন দিন তিন দিন করে দু জায়গায় পড়াতে হয়। একটা নিউ আলিপুরে, একটা বিডন স্ট্রিটে। কলেজ ছুটির পর হাতে দু-এক ঘন্টা সময় থাকে, তখন বাড়ি ফেরাও যায় না। সেই সময়ে মনীশ কলেজস্ট্রিটে একটি ছোট প্রকাশকের দোকানে আড্ডা দিতে আসে।

সামনে কাউন্টার, মাঝখানে উঁচু উঁচু বই-এর র‍্যাক, তার আড়ালে একটা ছোট টেবিল ও কয়েকটা চেয়ার। আরও কয়েকজন আড্ডাধারী আসে, এক একদিন বসবার জায়গা পাওয়া যায় না, টুল জোগাড় করতে হয় বা বইয়ের গাদাতেই কোনো রকমে পেছনটা ঠেকিয়ে রাখা। দোকানের মালিক সুরঞ্জন কলেজে পড়তো মনীশের সঙ্গে। সুরঞ্জন নিজেও আড্ডা ভালোবাসে এবং চা ও সিগারেটের ব্যাপারে উদার।

এ দোকানে প্রায় সবই স্কুল-কলেজের টেক্সট বই বিক্রি হয়, মনীশের পড়ার মতন কিছু নেই, তবু নতুন বইয়ের গন্ধ, অনেক বইয়ের সাহচর্য তার ভালো লাগে। দোকানটাতে সে এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে কোনো কোনো দিন কাউন্টারের কর্মচারী অনুপস্থিত থাকলে সে নিজেই কাউন্টারে দাঁড়িয়ে খদ্দেরদের ক্যাশমেমো কেটে দেয়।

এই দোকানের আড্ডায় নিয়মিত সে আর দু'তিন জন আসে, তাদের মধ্যে রজত একটি ইনিগমা। ঠিক কোনো বাংলা শব্দ দিয়ে বোঝানো যায় না। রজতের চেহারা ভালো, রাইটার্স বিল্ডিংসের ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে, পোশাকে সুরুচি আছে। ইতিহাস বিষয়ে সে একটি প্রবন্ধের বই লিখেছে, মনীশ সেটা পড়ে দেখেছে, দারুণ কিছু না হলেও একেবারে এলেবেলে নয়। কথাবার্তাও বেশ আকর্ষণীয়। রজতের সঙ্গে মনীশের বেশ ভাব জমে উঠেছিল, অনেকদিন দু'জনে একসঙ্গে কলেজস্ট্রিট থেকে হাঁটতে হাঁটতে এসপ্লানেড পর্যন্ত এসেছে।

দীপার কাছে রাত্রে শুয়ে শুয়ে মাঝে মাঝেই কলেজস্ট্রিটের এই আড্ডার নানা প্রসঙ্গ ওঠে। প্রথম যেদিন রজতের ইতিহাসের বই সম্পর্কে মনীশ কিছু একটা উল্লেখ করেছিল, তখন দীপা চমকে উঠে বলেছিল, ইতিহাসের বই...রজত...তার মানে কোন রজত ? লম্বা, ফর্সা মতন, বেশ গাঢ় ভুরু !

ঠিক রজতেরই বর্ণনা। মনীশ জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি তাকে চেনো ?

—খুব ভালো চিনি। আমার দাদার বন্ধু।
—বেশ চমৎকার মানুষটি।
—হ্যাঁ, বেশ ভালোই তো। খুব ভদ্র। আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।
—তোমাকে···বিয়ে করতে···চেয়েছিল ?
—হ্যাঁ।
—তুমি রাজি হওনি ? কেন ?
—তা তোমাকে বলবো কেন ?
মুচকি হেসে দীপা ঐ প্রসঙ্গের ইতি টেনে দিয়েছিল। সে আর কিছু বলতে চায় না।

বিয়ের আগে স্ত্রীর যদি অন্য কোনো প্রেমিক থেকেও থাকে, তার সম্পর্কে বেশি কৌতূহল দেখানো সভ্যতাসম্মত নয়।

কিন্তু তারপর থেকে সে ঐ রজতকে একটু অন্য চোখে দেখে। রজতের ব্যবহারে কোনো খুঁত নেই। সে কি জানে না যে দীপা এখন তার স্ত্রী ? মনীশ নিজেই একদিন জানিয়ে দিল কথায় কথায়। তাতেও কিন্তু রজতের সে রকম কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। সে বললো, হ্যাঁ, শুনেছি, আমার বন্ধু অমিতাভ'র বোন দীপাকে আপনি বিয়ে করেছেন। দীপা খুব ভালো মেয়ে।

এর পরেও রজতের ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না ! সাবলীল ভাবে গল্প, হাসি-ঠাট্টা করে। এক এক সময় কি সে মনীশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে ? মনীশের এরকম মনে হয়, তবে ভুলও হতে পারে।

রজত স্পষ্টতই তার শত্রুপক্ষ। সে দীপাকে বিয়ে করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে এবং সে অমিতাভর বন্ধু। ঐ অমিতাভই তার বিয়ের ব্যাপারে ঘোর আপত্তি জানিয়েছিল। কিছুদিন আগেও একটা সিনেমা হলে সে আর দীপা একেবারে অমিতাভর মুখোমুখি পড়ে যায়, অমিতাভ একটা কথাও না বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। দীপা সেদিন মনীশকে বলেছিল, তুমি কক্ষনো যেচে দাদার সঙ্গে কথা বলতে যাবে না। তুমি কি কিছু অন্যায় করেছো ? তুমি জোর করে আমায় কেড়ে এনেছো ?

রজতের এই নিখুঁত নিরপেক্ষ ব্যবহারের মানে বোঝা খুবই শক্ত।

একটা পরীক্ষা করবার জন্য মনীশ গত মাসেই একদিন কলেজস্ট্রিটের এই আড্ডার বন্ধুদের খাবার নেমন্তন্ন করেছিল বাড়িতে। রজতকে বাদ দেবার তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং রজতের সুবিধে মতন তারিখ অনুযায়ী সে দিন ঠিক করেছে। রজতও তো ছুতো দেখিয়ে পাশ কাটাবার চেষ্টা করেনি।

মনীশের বাড়িতে এসেও রজতের ব্যবহারে কোনো আড়ষ্টতা ছিল না। দীপাকে দেখে হাসি মুখে জিজ্ঞেস করেছিল, কেমন আছো, দীপা ? বাঃ, চেহারাটা তো সুন্দর হয়েছে এখন, মাঝখানে বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছিলে।

দীপাও বলেছিল, আপনি ভালো আছেন ? মাসিমার শরীর কেমন ? মানু এখন কী পড়ছে ?

দু'জনেরই যেন কোনো তিক্ততা নেই, রাগ নেই, অভিমান নেই। পুরোনো প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে, কিংবা একজন প্রেমিক ও তার অনিচ্ছুক প্রেমিকার মধ্যে এত স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকতে পারে ? হয়তো এটাই স্বাভাবিক। মনীশ গ্রামের ছেলে বলেই অন্যরকম ভাবছে, ঈর্ষা, হিংসা এইসব নিছকই গ্রাম্য ব্যাপার, মনীশ এখনো পুরোপুরি শহুরে হতে পারেনি !

কিন্তু মনীশ যে-সব গল্প-উপন্যাস পড়ে তার বেশির ভাগই জুড়ে থাকে ব্যর্থ প্রেমিকদের হা-হুতাশ !

তারপর মনীশ একটা উল্টো চাল শুরু করেছিল। সে ইচ্ছে করে রজতকে একটু খোঁচা মেরে কথা বলতে লাগলো। অকারণে, বিনা প্রসঙ্গে, তবে সরাসরি আক্রমণ নয়, ঘোরানো ফেরানো বিদ্রূপ। সূক্ষ্ম অবজ্ঞার ভাব। তাতেও বিশেষ বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলো না। মনীশ সে রকম খোঁচা মারতে শুরু করলেই রজত হাসতে হাসতে বলে, আরে মশাই, আপনি অত রেগে যাচ্ছেন কেন ? নাথিং পার্সোনাল !

ক্রমে মনীশ বুঝতে পারলো, উদারতার প্রতিযোগিতায় সে হেরে যাচ্ছে। অথচ তারই তো বেশি উদার হওয়া উচিত। দীপা তাকে অনেক উঁচু আসনে বসিয়ে দিয়েছে। যে-কোনো কারণেই হোক, দীপা রজতকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি, যদিও রজত বেশ শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, গ্রন্থকার, চেহারা ভালো এবং কলকাতায় তাদের নিজস্ব বাড়ি আছে।

কলেজস্ট্রিটের আড্ডায় কখনো গ্রামের প্রসঙ্গ উঠলেই সবাই মনীশকে বলে, মনীশ, একবার ব্যবস্থা করো না, তোমাদের গ্রামে ঘুরে আসি। একটা উইক এণ্ড কাটিয়ে আসবো। শুধু ভালো করে টাটকা মাছ খাওয়ালেই চলবে, আর কিছু চাই না !

মনীশ সে কথা শুনে, পাশ কাটিয়ে যায়। কতদূরে হারিয়ে গেছে সেই গ্রাম, কোথায় তাদের বাড়ি। পূর্ববঙ্গ থেকে যারা এসেছে, তারা ভাবে, শুধু তারাই বুঝি উদ্বাস্তু। কেন, পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্তু নেই ? দেনার দায়ে মনীশদের বসত বাড়িটাও বিক্রি হয়ে গেছে। কোথাও তার এক ইঞ্চি জমিও নেই। সে এখন

ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকে।

কলেজস্ট্রিটে আড্ডা দিয়ে, নিউ আলিপুরের টিউশনিটা সেরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে আবার রাত নটা।

বাস থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে তার হঠাৎ মনে পড়লো, চাঁদু কি বড়বাজারের ঠিকানাটা খুঁজে পেয়েছে? যদি পেয়ে থাকে তা হলে চাঁদু নিশ্চয়ই চলে গেছে এতক্ষণে। নাকি মনীশের কাছে বিদায় নেবার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে সে?

আহা, অত ঘটা করে বিদায় নেবার কী আছে? কলকাতা শহরে থাকলে মাঝে মাঝে তো দেখা হবেই। কিংবা, এ বাড়িতেও পরে সে আসতে পারে দেখা করতে। বই-টই-এর ব্যাপারে সাহায্যের দরকার হলে মনীশ নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করে দেবে। তার হাত-খরচের জন্য দু'একটা টিউশনিও জুটিয়ে দিতে পারে।

আর যদি আজও ঠিকানাটা খুঁজে না পায়?

পকেট থেকে একটা আধুলি বার করে মনীশ টস করতে লাগলো, চাঁদু আছে, না চলে গেছে? আছে না চলে গেছে? বাড়ি ফিরে চাঁদুকে সে দেখতে পাবে কি পাবে না?

আধুলিটা হাত ফস্কে পড়ে গেল মাটিতে। অন্ধকারের মধ্যে এখন আবার খুঁজতে হবে সেটাকে।

॥ ৩ ॥

বড়বাজারের লোকটির নাম ভূপেন দে। মনীশ একদিন নিজেই ঠিকানা খুঁজে খুঁজে হাজির হলো লোকটির বাড়িতে। তার কেন যেন সন্দেহ হয়েছিল, চাঁদু মিথ্যে কথা বলছে।

ভূপেন দে মোটাসোটা মাঝ-বয়েসী মানুষ, পোড়-খাওয়া মুখ, কপালে চিন্তার রেখা। এক একজন লোককে দেখলেই বোঝা যায় সাংসারিক বিষয় ছাড়া সে আর কিছুই জানে না, গান বাজনা, ছবি, কবিতা, প্রেম এসব তার কাছে অন্য গ্রহের ব্যাপার, ভূপেন দে লোকটিও সে রকম। অবশ্য সে রকম না হলে বড়বাজারের মতন জায়গায় সে পঁচিশ বছর টিকে থাকবেই বা কী করে? সে একটি মশলার আড়তের বড়বাবু, এই আড়তেরই দোতলায় দু'খানি ঘরে সে থাকে।

বিডনস্ট্রিটের ছাত্রীকে পড়িয়ে মনীশ এখানে এসেছে রাত সাড়ে আটটায়। ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতেই সাত জায়গায় ঠোক্কর খেয়ে শেষ পর্যন্ত মনীশ কাঠের

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে এই দোতলায়। বড়বাজারের ওপর দিয়ে সে অনেকবার যাতায়াত করেছে বটে, কিন্তু এই ব্যাক-ইয়ার্ড সে কখনো দেখেনি।

ভূপেন দে-ও সেই মাত্রই বাড়ি ফিরেছে। মনীশের সামনেই সে ঘামে ভেজা জামাটা খুললো দু' হাত উঁচু করে, মাথার ওপর দিয়ে গলিয়ে, দু' পকেট থেকে ঝনঝন করে খসে পড়লো কয়েকটা খুচরো টাকা। অনেকদিন মনীশ কারুকে এইভাবে জামা খুলতে দেখেনি। তাদের গ্রামে দেখতো।

মনীশ হাত জোর করে বললো, নমস্কার, আমার নাম মনীশ দাস, আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এসেছি। আপনার একটু সময় হবে কী?

মনীশকে দেখে বিশেষ অবাক হলো না ভূপেন। যখন তখন অবাক হওয়া বোধহয় তার স্বভাবে নেই।

সে বললো, হ্যাঁ, আপনার নাম শুনেছি। প্রফেসার তো? বসুন, বসুন। আমি একটু বুকে-পিঠে জল দিয়ে আসি।

অধিকাংশ লোকই সাধারণ লেকচারার আর প্রফেসারের তফাত বোঝে না। বাংলাতেও দুটো আলাদা নামও নেই। মনীশ এ বিষয়ে জ্ঞান দেবারও চেষ্টা করে না।

মনীশ যখন প্রথম কলকাতায় পড়তে আসে তখন একটা চুল-কাটার সেলুনের সাইন বোর্ডের তলায় লেখা দেখেছিল, প্রোঃ নিতাইচরণ প্রামাণিক। তা দেখে মনীশ ভেবেছিল, সেলুনের মালিকরাও কী প্রফেসার হয়?

দু'এক মিনিট বাদেই ভূপেন ফিরে এলো, হাতে একটি ছোট মদের বোতল ও দুটি গেলাস। পেছন পেছন একটা বাচ্চা ছেলে এসে একটা জলের বোতল ও খানিকটা চানাচুর রেখে গেল।

ভূপেন দুটি গেলাসে মদ ঢেলে ঘাড় কাৎ করে দেখলো সমান হয়েছে কিনা, তারপর যেন নিশ্চিন্ত হয়ে মুখ তুলে মনীশকে জিজ্ঞেস করলো, আপনাকে কি জল দেবো, না সোডা লাগবে? সোডা নেই বাড়িতে, আনিয়ে দিতে পারি।

মনীশ একেবারে হতবাক। সে মদ্যপান করে কিনা সে কথা জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন বোধ করলো না লোকটা? এই রকম সময় বাড়িতে এলে লোকে সাধারণত চা-ই আশা করে।

মনীশ যে কখনো মদ-টদ চেখে দেখে নি তা নয়, সে রকম শুচিবাই তার নেই, মেসে থাকবার সময় সে রুমমেটদের অনুরোধে কয়েকবার চাঁদা দিয়েছে ও দু'চার চুমুক দিয়েছে। কিন্তু একজন অচেনা লোকের সঙ্গে মদ্যপান করবার ইচ্ছে তার বিন্দুমাত্র নেই।

সে বললো, মাপ করবেন, আমার ওসব চলে না !

ভূপেন সে বললো, আমি কিন্তু খাবো। আপনার আপত্তি নেই তো ? সারাদিন বড্ড খাটা-খাটনি যায়, বুঝলেন ! এদানি আবার লেবার প্রবলেম শুরু হয়েছে ! সারাদিন হাজার রকম ঝামেলা, তারপর যদি রাত্রে ঘুম না হয় তাহলে শরীর টিকবে কী করে, বলুন ? এটা আমার ঘুমের ওষুধ, একটু দাম বেশি পড়ে যায়, কিন্তু খুব ফেইথফুল ! তাহলে আমি খাই ?

মনীশ বললো, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

ভূপেন জল মেশালো না, কিচ্ছু না, এক চুমুকে প্রথম গ্লাসটি সাবাড় করে দিল।

তারপর বাঁ-হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে বললো, হ্যাঁ, এবার বলুন !

মনীশ বললো, চন্দ্রনাথ বলে একটা ছেলে...

—চাঁদু তো ? হ্যাঁ, সে এসেছিল তো এখানে, তাকে আমি সব বুঝিয়ে বলে দিইছি। সে সব বলে নি আপনাকে ?

মনীশ একটু চুপ করে গেল। লোকের ধারণা গ্রামের ছেলেরা সরল, সাদাসিধে হয়। কী মিথ্যে যে ওরা বলতে পারে, তা তো শহরের লোক জানে না !

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে সে বললো, না, সে বলেছে যে আপনার ঠিকানা সে খুঁজেই পায় নি।

—তাই বলেছে ? আপনি প্রফেসার মানুষ, ছেলে চরিয়ে খেতে হয়, জানেন তো সবই। আজকালকার ছেলেদের চোখে মুখে মিথ্যে বলতে আটকায় না ! অবশ্য এক হিসেবে ভুল কিছু বলেনি। আমি বলে দিইছি, বাবা, মাপ করো আমাকে, আমার এখানে জায়গা হবে না। আমি মরছি নিজের জ্বালায় !

—আপনার নামে একটা চিঠি এনেছিল।

—হ্যাঁ, সুধীরদার চিঠি। ওঁকে আমি খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করি। ওঁর কথায় আগে দু'একজনকে জায়গা দিইছি, তখন সামর্থ্য ছেল। এখন বড় বিপাকে পড়িছি মশাই !

দ্বিতীয়বার গেলাশে মদ ঢেলে আবার এক চুমুকে শেষ করে লোকটি এমন মুখভঙ্গি করলো যেন ভেতরটা তার জ্বলে যাচ্ছে। এরকম যদি কষ্টই হয়, তবে খাওয়া কেন ?

এবারে ভূপেন একটি বিড়ি ধরালো।

লোকটি মদের জন্য যথেষ্ট পয়সা খরচ করে কিন্তু সিগারেটের বদলে বিড়ি।

ঐ বিড়িটা বোধহয় গ্রামীণ টান। মনীশ এসব লক্ষ্য করতে ভালোবাসে।

—পঁচিশ বছ্ছর এই মশলা কম্পানিতে কাজ কচ্ছি। মালিক আমাকে বিশ্বাস করে। যা মাইনে দেয় তাতে চলে না। এদিক ওদিক থেকে কিছু সরাতে হয়। কিন্তু তার তো একটা সীমা আছে। বেশি সরাতে গেলে ধরা পড়ে যাবো না ? মালিক তখন লাথি মেরে তাড়াবে, ঠিক কি না বলুন ? আগে এতেই বেশ চলতো, এখন খরচে খরচে একেবারে জেরবার হয়ে গেছি। আর একটা মুখকে যে খাওয়াবো, সে সাধ্য নেই। দেখবেন ? দেখবেন আসুন।

—কী দেখবো ?

—আসুন না, আসুন। নিজের চোখে দেখে যান।

মনীশের হাত ধরে টেনে তুললো ভূপেন।

এদিকটার এই সব বাড়ি বোধহয় দেড়শো দুশো বছরের পুরোনো। মোটা মোটা স্যাঁৎসেঁতে দেয়াল। ছাদে কড়ি কাঠ। বসবার ঘরের পেছনটাই সুড়ঙ্গের মতন অন্ধকার, সেখান থেকে খানিকটা এগিয়ে ভূপেন একটা ঘরের দরজা ঠেলে খুললো। তারপর আলো জ্বালতেই মনীশ আঁতকে উঠলো একেবারে।

ঘরের মাঝখানে লোহার গরাদ বসানো। ঠিক জেলখানার সেলের মতন। তার ওপাশে একটা চৌকিতে বসে আছে গেরুয়া রঙের কাপড় পরা একজন স্ত্রীলোক। চল্লিশের কাছাকাছি বয়েস, বেশ ভরাট স্বাস্থ্য, চোখ দুটি বিস্ফারিত, যেন জ্বলছে। ঠিক মনে হয় এক বন্দিনী বাঘিনী !

মনীশকে দেখেই স্ত্রীলোকটি উঠে এসে গরাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললো, কে রে ? কে রে ? কে রে ?

ভূপেন বললো, চোপ ! এ আমাদের দেশের লোক।

স্ত্রীলোকটি ময়ূরের মতন কর্কশ স্বরে আবার চেঁচিয়ে উঠলো, কে রে ? কে রে ? কে রে ?

ভয় পেয়ে মনীশ চলে এলো দরজার বাইরে।

ভূপেন বললো, দেখলেন তো ? আমার স্ত্রী। পাঁচ বছর ধরে এই রকম অবস্থা। চিকিৎসার চোদ্দ পুরুষ করিছি। ডাক্তার-কবরেজে আমাকে ছিবড়ে করে ফেলেছে, তবু কিছুতেই কিছু হয় না। এই অবস্থায় বাড়িতে কোনো নতুন লোক রাখা যায় ? আপনিই বলুন ?

পুতুলের মতন ঘাড় নেড়ে মনীশ বললো, তা তো বটেই !

—পাগলা গারদে দিইনি কেন জানেন ? মাঝে মাঝে ভালো হয়ে যায়, এই দু'তিন মাস অন্তর, কয়েকটা দিনের জন্য। তখন আপনি দেখলে চিনতে পারবেন

না। তখন কী শান্ত, ছেলেমেয়েদের কত আদর করে। তারপর যখন আবার বিগড়োয়, তখন একেবারে অসহ্য অবস্থা করে তোলে। একদিন আমার দিকে জ্বলন্ত উনুন ছুঁড়ে মেরেছিল। রাস্তায় খেদিয়ে দিইনি, হাজার হোক আমার ছেলেমেয়ের গর্ভধারিণী তো বটে!

আগেকার ঘরটিতে ফিরে এসে ভূপেন বললো, বসুন। আপনি কিছুই খাবেন না?

—নাঃ, আমি এবার যাবো। অনেক দূরে যেতে হবে।

—ঠিক আছে, আলাপ হলো। আসবেন মাঝে মাঝে। বুঝলেন স্যার। ঐ ছেলেটা, ঐ চাঁদু,সুধীরদা ওর হাতে চিঠি পাঠিয়েছেন, ওর যদি কোনোই জায়গা না থাকতো, তা হলে আমি নিচে আড়তের এক কোণে কোনো মতে ওর জন্য একটা শোয়ার ঠাঁই করে দিতুম। কিন্তু শুনলুম যখন আপনার মতন একজন মান্যগণ্য লোকের বাড়িতে উঠেছে, তখন ভাবলুম, জলে তো পড়েনি। আপনি ওকে ঠিকই দেখবেন। হয়তো আপনার অসুবিধে হবে খানিকটা। তাছাড়া এরকম জায়গায় থাকলে ওর কি লেখাপড়া হতো, বলুন?

মনীশ আবার বললো, তা তো বটেই!

—আপনার স্ত্রীর শরীর-স্বাস্থ্য ভালো তো? যে পুরুষমানুষের বউয়ের পার্মানেন্ট অসুখ থাকে, তার মতন দুর্ভাগা আর কেউ নেই। তার জীবনটাই বরবাদ হয়ে যায়। পরম শত্রুরও যেন এরকম না হয়।

উঠে দাঁড়িয়ে মনীশ নিজের বুকে হাত বুলোতে বুলোতে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। না, দীপার কোনো অসুখ নেই। অসীম তার সহাশক্তি। চাঁদু আসবার পর সাতদিন হয়ে গেল, এখনো দীপা কোনো আপত্তি জানায়নি।

মনীশ বিদায় নিয়ে কাঠের সিঁড়ির দিকে এগোতেই ভূপেন একটা মাঝারি কাগজের ঠোঙার প্যাকেট তার হাতে দিয়ে বললো, এটা নিয়ে যান। কিছুই তো সাহায্য করতে পারলুম না।

—এটা কী?

—কিলোখানেক এলাচ আছে।

—অ্যাঁ, এলাচ? এত এলাচ নিয়ে আমি কী করবো?

—নিয়ে যান, দামি জিনিস, কাজে লাগবে।

—না, না, না, এ আমার দরকার নেই।

—ভাবছেন বুঝি চোরাই? তা নয়। ঝাড়াই বাছাই হয়, ওজনের কারচুপি হয়, তাতে কিছু বাঁচে। মালিকের হিসেব ঠিকই থাকে। এটা আমাদের ন্যায্য

পাওনা।

মনীশের কোনো আপত্তিই শুনলো না, ভূপেন তার হাতে জোর করে ঠোঙাটা গুঁজে দিল। ন্যায্য কথাটার এমন অদ্ভুত ব্যবহার মনীশ আগে কখনো শোনেনি।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে মনীশ বুঝতে পারলো চাঁদু কেন মিথ্যে কথা বলেছে। ঠিকানাটা খুঁজে পাইনি বলার মানে হলো ব্যাপারটাকে ঝুলিয়ে রাখা। মনীশরা তবু ভাববে যে কোনোদিন ঠিকানাটা খুঁজে পেলে চাঁদু চলে যেতে পারে।

এলাচগুলো পেয়ে দীপা খুব খুশি। আগে তার এলাচ খাওয়ার অভ্যেস ছিল। তার হাতব্যাগে একটা ছোট্ট কৌটোতে এলাচ থাকতো। বিয়ের পর সে আর এলাচ কেনে না। খুব দাম যে! এখন এতগুলো এলাচে তার এক বছর চলে যাবে।

কোথা থেকে যে কী জিনিস জুটে যায় তার ঠিক নেই। ভাগ্যিস মনীশ ভূপেন দে-র খোঁজ করতে গিয়েছিল, তাই সে দীপাকে খুশি করতে পারলো। দীপাকে যে কী উপহার দেওয়া যায়, তার মাথাতেই আসে না।

চাঁদু এখন এ বাড়ির নিয়মিত রাঁধুনী। দু'বেলাই সে রান্না করে। আজ সন্ধেবেলা সে দু'খানা ফুলকপি কিনে এনেছে। অফ্ সিজনের জিনিস, খুব দাম। ও দুটো সাত-আট টাকা তো হবেই। চাঁদুর মোট সম্বল তো মোটে তিনশো টাকা। তার থেকেই এ সব বাবুয়ানি করার কী দরকার?

আলু-ফুলকপির ডালনাটা কিন্তু রেঁধেছে চমৎকার। গরম মশলা দেয়নি, তবু গরম মশলার স্বাদ।

কুশের সঙ্গে চাঁদুর খুব ভাব হয়ে গেছে। গ্রামের ছেলে হলেও কুশের স্বাস্থ্য ভালো নয়। খালি গা হলে তার বুকের হাড় গোনা যায়। দীপার মর্নিং স্কুল বলে বাধ্য হয়েই তাকে সকালের রান্নার ভার নিতে হয়েছিল। এখন সে বেঁচে গেছে।

কুশ বললো, চাঁদু, তুই পড়াশুনো করে কী করবি? তুই বরং একটা হোটেল খোল। তুই রান্নার সাইডটা দেখবি, আমি হবো ম্যানেজার।

মনীশ বললো, মন্দ আইডিয়া না। বি এ, এম এ পাশ করেও তো চাকরি পাওয়া যাবে না। সব চাকরি শেষ!

কুশ বললো, হোটেল খুলতে অবশ্য ক্যাপিটাল লাগে। দাদা, তুমি আমাদের সেই টাকাটা দিয়ে দেবে?

মনীশ বললো, দাঁড়া, আগে লটারির ফার্স্ট প্রাইজটা পাই!

চাঁদু লাজুক লাজুক মুখে বললো, যেমন করেই হোক আমাকে পার্ট টু পাশ করতেই হবে। সুধীরদাকে কথা দিয়েছি। পাশ করে গ্রামে ফিরে যাবো, গ্রামের

ইস্কুলে পড়াবো।

দীপা বললো, এবারে সব উঠে পড়ো, উঠে পড়ো ! অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে।

রান্নাঘরে টুকিটাকি কাজ সারতে খানিকটা দেরি হয় দীপার। মনীশ একটার বদলে দুটো সিগারেট খেয়ে জেগে থাকে। ভূপেন দে-র বাড়ির অভিযান-কাহিনীটা দীপাকে শোনাতে হবে। সারাদিনে দু'জনের প্রায় দেখাই হয় না, রাত্তিরে এই সময়টাতেই যা গল্প হয়।

ঘরে এসে দীপা এলাচের কয়েকটা দানা মুখে দিয়ে এমন ভাব করে যে যেন সে স্বর্গ-সুখ পাচ্ছে। তা দেখে মনীশের মাথা ঘুরে যায়।

খাট থেকে উঠে এসে সে দীপাকে জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁট থেকে একটা সুগন্ধ চুম্বন তুলে নিল।

সেই জড়িয়ে ধরা, সেই চুম্বনের মধ্যে একটা দাবি আছে।

দীপা নিজেকে একটু ছাড়িয়ে নিয়ে মেঝেতে একটা মাদুর পাতলো। খাটের ওপরে বড্ড আওয়াজ হয়। পাশের ঘর থেকে সব শোনা যায়। তাতে দীপার লজ্জা করে। আগে তবু কুশ ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করতো। কুশের নাক ডাকা শুনে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। কিন্তু চাঁদু রাত জেগে পড়ে। পাশের ঘরে আলো জ্বলছে।

এই সময়ে স্বতঃস্ফূর্ত শব্দগুলো চেপে রাখতে হয়। মনীশ দীপার ঘাড় কামড়ে ধরে। শেষের দিকে দীপা তার মুখে হাত চাপা দেয়।

আবার চিৎ হয়ে শুয়ে মনীশ ভাবে, জীবনটা খুব সুন্দর ! যদিও অসহ্য গরম লাগছে। সারা গায়ে ঘাম। পাখা নেই, তবু এই মুহূর্তে বেঁচে থাকাটাই কত ঐশ্বর্যময় মনে হয়।

দীপা খুব সাবধানে দরজার ছিটকিনি খুললেও খুট করে একটা শব্দ হয়। তাকে একবার বাথরুমে যেতেই হবে।

মনীশের হঠাৎ গোপালপুরের সমুদ্রতীরের কথা মনে পড়ে। বিয়ের পর তারা সাতদিনের জন্য সেখানে বেড়াতে গিয়েছিল। সুরঞ্জনের কাছ থেকে সাত শো টাকা ধার করতে হয়েছিল তখন।

উঠেছিল এক বুড়ি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেমের কটেজে। সকালবেলা জলখাবারের সময় ডিমসেদ্ধ একটা এগ-কাপে দেওয়া হয়েছে দেখে মনীশ দারুণ রোমাঞ্চিত। ইংরিজি উপন্যাসে সে এরকম পড়েছে। হানিমুনিং কাপ্ল সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যায়। সেখানে এরকম ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয়। মনীশ বাপের জন্মে এগ-কাপ দেখেনি।

সেই এগ-কাপের উত্তেজনায় মনীশ দারুণ একটা বিলিতি কাণ্ড করে ফেলেছিল।

ওরা গোপালপুর পৌঁছেছিল বৃষ্টির মধ্যে। সারাদিনই প্রবল বৃষ্টি, সমুদ্রের কাছে যাবার উপায় নেই। সন্ধের পর বৃষ্টি কিছুটা কমলেও আকাশ একেবারে অন্ধকার, সমুদ্র অদৃশ্য। কিন্তু কে যেন মনীশকে বলেছিল, খুব অন্ধকার রাতে সমুদ্রের বুকে সারি সারি মালা দেখতে পাওয়া যায়। ঢেউ-এর মাথায় ফসফরাসের রেখা।

বুড়ি মেমের কাছ থেকে একটা ছাতা ধার করে ওরা দু'জনে গেল সমুদ্র দেখতে। একেবারে জলের ধার ঘেঁষে বালিতে বসেছে, বাঁচে একটাও মানুষজন নেই, আদিম পৃথিবীতে যেন ওরাই দু'জন মাত্র মানব-মানবী। ছাতা ফেলে দিয়ে মনীশ জড়িয়ে ধরেছিল দীপাকে, তারপর শুয়ে পড়েছিল। আকাশের নিচে, জলোচ্ছ্বাসের পশ্চাৎ-সঙ্গীতে ওরা হারিয়ে গিয়েছিল পরস্পরের মধ্যে।

জীবনে যে এ রকম আনন্দ থাকতে পারে তা মনীশের কল্পনার মধ্যেও কোথাও ছিল না।

দীপা বাথরুম থেকে ফিরতেই মনীশ জিজ্ঞেস করলো, দীপা, তোমার মনে আছে, সেই গোপালপুরে ?

গোপালপুরে সাতদিন থাকার মধ্যে ঐ রাতটাই ছিল প্রধান ঘটনা। দীপারও ঠিক ঐ কথাটাই মনে পড়ে।

সে হেসে বললো, ওঠো, খাটে যাও, মাদুরটা তুলবো।

মনীশ উঠলো না, দীপার হাত ধরে টেনে তাকে আবার মাদুরে নামিয়ে আনলো।

ভূপেন দে'র বাড়ি থেকে বেরুবার সময়ই মনীশের মনে হয়েছিল, ঐ লোকটার তুলনায় সে কত সুখী ! বাড়িতে ঐ রকম একটা হিংস্র, পাগল বউ, ও ঐ রকম ভাবে মদ খাবে না তো কী করবে ? রজত বেচারিরও খুব দুর্ভাগ্য। ও আর বিয়ে করেনি কেন ? মনীশ ঠিক করেছে, সে আর রজতের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না।

খানিকবাদে দীপা বললো, আমার বোধহয় দু'একটা টেস্ট করাতে হবে !

—কেন, কী হয়েছে ? তোমার শরীর খারাপ ?

—না, তা নয়। আমার দু'তিন মাস।

—অ্যাঁ ?

—মনে হচ্ছে যেন।

মনীশ ধড়মড় করে উঠে বসে বললো, না, না, না, এখন না। এখন দরকার নেই।

—আমিও তো এখন চাই না—। কিন্তু তুমি এমন পাগলামি করো।

—এখন হলে খুব মুস্কিলে পড়ে যাবো। আর অন্তত এক বছর বাদে, ধারটারগুলো শোধ করে নিই।

—এই, আস্তে!

মনীশ ফিসফিস করে বললো, এখনো তোমার স্কুলের কাজটা পার্মানেন্ট হয়নি। এখন ছুটি দেবে না।

—তা হলে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।

—মাঝে মাঝে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখি, এখন তো এসব লিগ্যাল, তাই না?

—হ্যাঁ, ঝামেলার কিছু নেই। তবে কিছু খরচ তো লাগবে।

—সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আগে একটা পাখা না কিনলেই নয়, তাছাড়া রান্নার গ্যাস আনতে হবে। কেরোসিন প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছে না…

গোপালপুরের সেই তীব্র সুখময় রাতের স্মৃতি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

॥ ৪ ॥

কলেজের স্টাফরুমে যে সব সময় সাহিত্য বা রাজনীতি বা বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা চলে তা নয়, মাছের দাম-বাড়া কিংবা পে স্কেল রিভিশান-এর মতন তুচ্ছ বিষয় নিয়েও ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যেতে পারে।

এ-বছরে ইলিশ মাছ চল্লিশ টাকার নিচে নামলো না, এই সূত্র ধরেই কমার্সের ধীরেনবাবু বললেন, কদিন ধরে খাওয়া-দাওয়ার যা কষ্ট হচ্ছে, কী বলবো! স্ত্রী অসুস্থ, এমন হাঁপানি যে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না, এর মধ্যে আবার রান্নার লোকটা পালিয়েছে। আজকাল কাজের লোক পাওয়া এমন মুস্কিল! ভাই তোমরা তোমাদের বউদের একটু বলবে যদি আমার বাড়ির জন্য একটা রান্নার লোক ঠিক করে দিতে পারেন! আমি ভালো মাইনে দেবো।

অন্য দিন ধীরেনবাবু রাজনৈতিক তর্কে গলা ফাটান, জোরে কথা বলার সময় তাঁর গলার অ্যাডাম্‌স আপেলটা ওঠা-নামা করে। আজ তাঁকে বেশ কাতর মনে হলো।

মনীশের চড়াৎ করে মনে পড়লো চাঁদুর কথা।

ধীরেনবাবুর বাড়িতেই তো চাঁদুর জায়গা হতে পারে। ও বাড়িতে থাকবে,

খাবে, রান্নাটা করে দেবে। চাঁদু কমার্সের ছাত্র, ধীরেনবাবুর কাছ থেকে পড়াটাও বুঝে নিতে পারবে মাঝে মাঝে। মনীশের কাছ থেকে তো চাঁদু সেরকম কোনো সাহায্য পায় না। ধীরেনবাবুর বাড়িতে কিছু হাত-খরচও পাবে।

এর আগে চাঁদুকে দু' তিন জায়গায় পাঠাবার চেষ্টা হয়েছে। কোথাও সুবিধে হয়নি। পার্টটাইম কাজ দিতে কেউ কেউ রাজি আছে, কিন্তু বাড়িতে রাখতে চায় না। মনীশের চেনাশুনো জগতের সকলেরই ছোট ছোট সংসার, দু' আড়াইখানা ঘরের ফ্ল্যাট। সেসব বাড়িতে চাকর রাখা যায়, যে সিঁড়ির তলায় কিংবা রান্নাঘরে শোবে, কিন্তু কোনো কলেজের ছাত্রকে আলাদা ঘর দিয়ে রাখা যায় না।

চাঁদুকে নিয়ে মনীশদের বেশ অসুবিধে হচ্ছে। খরচ তো বেড়েছে বটেই, তাছাড়াও ঝঞ্ঝাট আছে। চাঁদু বেশি জল খরচ করে ফেলে। গ্রামের অভ্যেসটা এখনো যায় নি, কলকাতার ভাড়া-বাড়ির মেপে মেপে জল ব্যবহারের পদ্ধতিটা এখনো শিখতে পারছে না। মনীশ প্রায়ই স্নানের জল পায় না।

চাঁদু ওয়াক ওয়াক শব্দ তুলে মাঝে মাঝেই রান্নাঘরের জানালা দিয়ে থুতু ফেলে। মনীশ অনেকবার বারণ করেছে তবু শোধরায় না ওর এই স্বভাবটা। রান্না ঘরে দাঁড়িয়ে থুতু ফেললে মনীশের ঘেন্না-ঘেন্না করে। দীপাও এজন্য কয়েকবার বকেছে চাঁদুকে।

চাঁদুর আর একটা অদ্ভুত আবদার হয়েছে। নতুন পাখা এসেছে, প্রথম প্রথম একটু আদিখ্যেতা হয় ঠিকই। তা বলে দুপুরে দীপা ঘুমোতে পারবে না? ক'দিন আগে চাঁদু দীপাকে দুপুরবেলা বলেছিল, বৌদি, বড্ড গরম, তোমার ঘরে পাখার তলায় বসে পড়াশুনো করতে পারি? আমি মেঝেতে বসবো, তোমার অসুবিধে হবে না!

তারপর সে মেঝেতে বই-খাতা ছড়িয়ে বসলো। ঘরে অন্য একজন মানুষ থাকলে কোনো মেয়ে কি ঘুমোতে পারে?

মনীশ এই কথা শুনে চটে আগুন হয়েছিল। নবাবী চাল, অ্যাঁ? জীবনে কবে পাখার হাওয়া খেয়েছে চাঁদু? এখন পাখার হাওয়া ছাড়া তার পড়াশুনো হয় না?

মনীশ এ জন্য চাঁদুকে বকতে গিয়েছিল, দীপা বাধা দিয়েছে। এই ব্যাপার নিয়ে বকাবকি করাটা নাকি ভালো দেখায় না। কয়েকদিন যাক, তারপর দীপা নিজেই বুঝিয়ে বলবে। অবশ্য তার পরে দুটি দুপুরই লোডশেডিং ছিল।

ধীরেনবাবুকে দরজার বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে মনীশ বললো, ধীরেনদা, আপনার যখন এত অসুবিধে, আমার জানা একটি ছেলে আছে। আপনি ছেলে রাখবেন?

ধীরেনবাবু বললেন, ছেলে মেয়ে যাই হোক, কোনো আপত্তি নেই। মোটামুটি রাঁধতে জানে তো? দাও না ভাই। বড্ড উপকার হয়!

—খুব ভালো রান্না করে। ছেলেটির স্বভাব-চরিত্র ভালো, খুব বিশ্বাসী। কলেজে পড়ে।

—অ্যাঁ? কলেজে পড়ে?

—কলেজে আর কতক্ষণ? শুধু দুপুরটা। এগারোটার মধ্যে আপনাদের রান্নাটা সেরে দিয়ে বেরিয়ে আসবে, পাঁচটার মধ্যে ফিরে যাবে।

—কিন্তু কলেজে পড়ে, রান্নার কাজ করবে?

—গ্রামের ছেলে, রান্নার কাজ জানে, সে কাজ করবে না কেন?

—কোন্ কলেজে পড়ে, আমাদের এখানে নয় তো?

—না, অন্য কলেজে।

—ঠিক আছে, পাঠিয়ে দাও, আজই পাঠাতে পারলে ভালো হয়!

মনীশের বুক থেকে যেন একটা বিরাট বোঝা নেমে গেল।

কিন্তু এর পরে বাথরুমে মুখ ধুতে গিয়ে সে বিষম খেলো খুব জোরে। মনে হয় যেন দম আটকে আসছে, চোখটা অন্ধকার অন্ধকার!

মনীশ জোরে জোরে হাত ঘষতে লাগলো বুকে। মাঝে মাঝে এরকম হয় কেন? গ্যাসের চাপ? কিছু একটা খাবারের জন্য পেটে প্রায় এরকম গ্যাস হচ্ছে। একবার ডাক্তার না দেখালে চলবে না।

একটুবাদেই ব্যথাটা চলে গেল। মনীশ বাড়ি ফিরলো খুব উৎফুল্ল মেজাজে। চাঁদুকে বললো, তোর জন্য খুব ভালো ব্যবস্থা হয়ে গেছে, বুঝলি? প্রফেসার ডি এন ঘোষের নাম শুনেছিস? ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কমার্সের বই আছে ওঁর, তোদের পাঠ্য নেই?

চাঁদু বললো, হ্যাঁ আছে। আমার কেনা হয়নি এখনো।

—আর কিনতে হবে না, ফ্রি পেয়ে যাবি। ঐ ধীরেন ঘোষের বাড়িতেই তোর থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। উনি খুব আগ্রহ দেখালেন। তোর জিনিসপত্র গুছিয়ে নে। এক্ষুনি যেতে হবে।

দীপা তার স্কুলের এক সহকর্মিণীর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেছে। কুশও এখন বাড়ি নেই।

চাঁদু একটু ইতস্তত করে বললো, বৌদির সঙ্গে দেখা করে যাবো না?

—তুই কি আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে চলে যাচ্ছিস নাকি? মাঝে মাঝে আসবি, তখন বৌদির সঙ্গে দেখা হবে। আজ আর দেরি করিস না। উনি তোর

জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকবেন।

ঠিকানা দিয়ে, রাস্তা বুঝিয়ে দিয়ে চাঁদুকে সে পাঠিয়ে দিল একটু বাদেই। কোনো সন্দেহ নেই যে চাঁদুর জন্য এটা খুবই ভালো ব্যবস্থা হয়েছে।

মনীশ মাঝে মাঝেই নিজেকে প্রশ্ন করে। সে যে চাঁদুকে বললো, ধীরেন ঘোষ চাঁদুর জন্য আগ্রহ দেখিয়েছেন, এই আগ্রহ কথাটা কি সে মিথ্যে বললো? কিংবা তিনি চাঁদুর জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকবেন, এই অপেক্ষা শব্দটা? কোনোটাই মিথ্যে নয়। তবে, ভূপেন দে যে-ভাবে 'ন্যায্য' কথাটা বলেছিল, এই দুটো শব্দও সে-রকম!

দীপা ফিরে এসে সব শুনে বললো, তুমি ওকে আজ সন্ধেবেলাই পাঠিয়ে দিলে? কাল আগে একবার গিয়ে না হয় বাড়িটা দেখে আসতো, কথাবার্তা বলে ঠিকঠাক করে নিত!

—ধীরেনদা যে বললেন, ওঁর খুবই অসুবিধে হচ্ছে। ওঁর স্ত্রী অসুস্থ। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো।

—চাঁদু ওবাড়িতে রাঁধুনী হিসেবে গেল, ছাত্র হিসেবে নয়!

—বাঃ, চাঁদু আমাদের এখানে রান্না করতো না?

—তা করতো, কিন্তু আমরা সবাই মিলে সাহায্য করতুম, ও এখানে ঠিক রাঁধুনী ছিল না। রান্নার কাজ খুঁজলে ও তিন মাসের মধ্যে অনেক আগেই চাকরি পেতে পারতো!

—তুমি কি ওকে আমাদের বাড়িতেই রাখতে চাও? তোমাকে আর কুশকে যাতে হাঁড়ি ঠেলতে না হয়, সেই জন্য?

—সে আমরা আগের মতন ঠিকই কাজ চালিয়ে নিতে পারবো। সে জন্য বলছি না। বলছিলুম যে, ও একজন ছাত্র, পড়াশুনোর জন্য কলকাতায় এসেছে, রান্নার কাজ খুঁজবার জন্য নয়!

—দ্যাখো, ও আমার বাড়িতে এসে উঠেছিল—আমি কলেজে পড়াই—ধীরেনদাও কলেজে পড়ান—তাঁর বাড়িতে থাকবে, এতে তফাতটা কী হবে বুঝতে পারছি না। ধীরেনদার অবস্থা আমার চেয়ে অনেক ভালো।

—তফাতটা হচ্ছে এই যে ধীরেনবাবুর স্ত্রী অসুস্থ। চাঁদুকে সেখানে গিয়ে পুরোপুরি রান্নাঘরের ভার নিতে হবে। ওনার ছেলেমেয়ে আছে, তাদের আলাদা আলাদা খেতে দিতে হবে।

—আমি বুঝতে পারছি না, দীপা, তুমি কী চাও!

দীপা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর আস্তে

আস্তে বললো, যাক, ঠিক আছে, হয়তো ওর ভালোই হবে ওখানে।

কুশের প্রতিক্রিয়া হলো অন্যরকম। সে নিরাশভাবে বললো, চাঁদুটা চলে গেল? মহা নিমকহারাম তো!

মনীশ গরম গলায় বললো, এখানে থাকলে ওর খরচটা কে চালাবে শুনি?

—আমার এবার ফাইন্যাল ইয়ার। আমাকে এখন রোজ সকালে পড়াশুনো ছেড়ে রান্না করতে হবে?

—রান্নার জন্য তোর পড়াশুনো নষ্ট হয়? সন্ধেবেলা কী করিস? রোজ তোর ফিরতে এত রাত হয় কেন?

—বাঃ, আমাকে টিউশানি করতে হয় না?

—চল্লিশ টাকা মাইনে। সপ্তাহে ছ'দিন, রাত দশটা পর্যন্ত? ঐ ছাত্রর টিউশানি তোকে করতে হবে না, কালই ছেড়ে দিয়ে আয়, কুশ, একটা কথা বলে রাখছি। আজেবাজে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করলে আমি কিন্তু সহ্য করবো না!

দীপা মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো, এই, তুমি ওকে এত বকছো কেন? ঠিক আছে, সকালবেলার রান্নাটা আমি যতটা পারি করে দিয়ে যাবো।

মনীশ হুংকার দিয়ে বললো, না, মোটেই তুমি তা করবে না। তোমার এখন শরীরের যত্ন নেওয়া দরকার। কাজ কমাতে হবে। কুশ না পারে, সকালের রান্না আমিই করবো!

কুশ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চাঁদুর মতন আমাকেও বিদায় করতে পারলে তোমাদের সুবিধে হয়, তাই না?

মনীশের মুখখানা রক্তশূন্য হয়ে গেল। সে একটা জোর আঘাত পেয়েছে। কতখানি স্বার্থত্যাগ করে সে বিয়ের পর নতুন সংসার পাতবার পরই কুশকে এখানে রেখেছে তা ও জানে না? সহোদর ভাইও এত অকৃতজ্ঞ হয়? বাবার ঋণ তাকে একলা শোধ করতে হচ্ছে, সব সময় টাকার চিন্তা, দীপার সাধ-আহ্লাদ সব বিসর্জন দিতে হয়েছে···

প্রত্যুত্তর দেবার বদলে মনীশ ঠাস করে এক চড় কষালো ছোট ভাই-এর গালে।

কুশ ভাতের থালাটা উল্টে দিয়ে বললো, তোমাদের বাড়ির ভাত আর আমি কোনদিন খাবো না। কোনোদিন না! আমি আজই চলে যাচ্ছি!

—যা না, কোথায় যাবি, যা! দেখি তোর কত মুরোদ!

কুশ দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসেই আলনা থেকে টেনে টেনে

তার জামা-প্যান্ট নামাতে লাগলো।

দীপা চুপ করে বসে আছে। কয়েকবার সে মনীশের চোখের দিকে চোখ ফেলার চেষ্টা করলো, কিন্তু মনীশ তাকাচ্ছে না তার দিকে।

টিনের সুটকেশে সব কিছু ভরে নিয়ে কুশ বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই দীপা বললো, দাঁড়াও, কুশ, একটা কথা শুনে যাও!

বুনো ঘোড়ার মতন কুশ ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ালো।

দীপা বললো, তোমার দাদা তোমাকে মেরেছে, তুমি রাগ করে চলে যাচ্ছো, আমি বুঝি এই বাড়ির কেউ নই? আমাকে তোমার কিছু বলার দরকার নেই?

—বৌদি, আমি আর তোমাদের বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। আমি চলে যাচ্ছি!

—কোথায় যাবে?

—আমার অনেক থাকার জায়গা আছে, তা নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না।

মনীশ চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, বটে? অনেক জায়গা আছে? তা হলে এতদিন বলিস নি কেন? কলকাতা শহরে তোর মতন একটা অপদার্থকে···

দীপা এবারে স্বামীর দিকে তাকিয়ে কঠোর ভাবে বললো, আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগছে, তুমি এরকম ভাষা ব্যবহার করতে পারো, আমি ভাবতেই পারি নি!

স্ত্রীর বকুনি শুনে নয়, ঐ খারাপ ভাষার অভিযোগটা শুনে মনীশ একটু দুর্বল হয়ে গেল। সে ভাষা-সচেতন। এত রাগের মধ্যেও সে দ্রুত চিন্তা করতে লাগলো, কোনটা খারাপ ভাষা? মুরোদ, অপদার্থ?

কুশ ঝুপ করে নিচু হয়ে দীপার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললো, বৌদি, তোমার ওপর আমার কোনো রাগ নেই। কিন্তু আমি চলে যাচ্ছি। আমাকে আটকিয়ো না!

দীপা বললো, দাঁড়াও, আগে আমার একটা কথা শুনে যাও!

তারপর স্বামীকে সে আদেশ দিল, তুমি পাশের ঘরে যাও তো! কুশের সঙ্গে আমি একটু কথা বলবো!

মনীশ উঠে হাত ধুয়ে চলে গেল নিজের ঘরে।

দীপা কুশের বাহুতে হাত রাখলো। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললো, তুমি যেতে চাইলে আমি আটকাবো না। কিন্তু এখন, এই রাত্তিরে যেও না। কাল সকালে যেও। আমিও তোমার সঙ্গে যাবো, তুমি যেখানে থাকার

জায়গা ঠিক করেছো, সেই জায়গাটা আমি দেখে আসবো !

খাটে বসে সিগারেট ধরাতেই বুক ব্যথা করতে লাগলো মনীশের। এই হারামজাদা গ্যাস তাকে বড্ড জ্বালাচ্ছে। এই সময় সিগারেট টানলে ব্যথাটা আরও বাড়ে। কিন্তু আস্তো সিগারেটটা সে ফেলে দেবে কী করে ? সে বুকেও হাত বুলোতে লাগলো, সিগারেটেও টান দিতে লাগলো।

দীপা এখনো পাশের ঘরে। এত কী কথা বলছে কুশের সঙ্গে ? একটু কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে না ? কে কাঁদছে ? মনীশের খুব ইচ্ছে হলো উঁকি মেরে দেখতে, কিন্তু গেল না।

দীপা কি এই ঘরে ফিরে এসে তাকে বকুনি দেবে ! তার সঙ্গে ঝগড়া করবে ? এই ধরনের ব্যাপার আগে কখনো ঘটেনি। কত লোক তো রাগের মাথায় শালা, শুয়োরের বাচ্চা, আরও কত কী বলে, মনীশ সে সব শব্দ কোনোদিনই উচ্চারণ করে না, তবু দীপা বললো সে খারাপ ভাষা ব্যবহার করেছে ?

কুশকে ও-রকমভাবে চড় মারাটা হয়তো তার উচিত হয়নি। কিন্তু মানুষের কি কখনো রাগ হবে না ? কুশ ঐ রকম গোঁয়ারের মতন...

পাশের ঘরে কান্না থেমে গেছে। দীপা রান্না ঘরে, থালা বাসনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে সেখান থেকে। আজ কারুরই খাওয়া হলো না ভালো করে। রাগ জিনিসটা সত্যি বড্ড খারাপ। আজ প্রথম থেকেই কেন রাগ হয়ে যাচ্ছিল ?

দীপা আসবার আগেই ঘুমিয়ে পড়লে কেমন হয় ? মনীশ চোখ বুজলো। পাখার হাওয়াতে খুব আরাম হচ্ছে, এই ক'দিন ঘুম আসছে তাড়াতাড়ি।

থালা বাসনের শব্দ থেমে গেছে, তার বদলে গানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দীপা গান গাইছে ? অনেকদিন বাদে। রান্না ঘরে কেন ? আজ এত কাণ্ডের পর দীপার মনে গান এসে গেল ?

মনীশ কান খাড়া করে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করলো। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অতুলপ্রসাদের গান।

মনীশের হঠাৎ কয়েকটা কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল। হুইটম্যানের "লীভস অফ গ্রাস" থেকে—

মনীশের ইচ্ছে করলো, উঠে গিয়ে রান্না ঘর থেকে দীপার হাত ধরে নিয়ে আসে। কিন্তু বুকের ব্যথাটা কমছে না, উঠতে ইচ্ছে করছে না বিছানা ছেড়ে।

সে বিড় বিড় করে বলতে লাগলো, ব্যাটলস আর লস্ট ইন দা সেইম স্পিরিট...ব্যাটলস আর লস্ট ইন দা সেইম স্পিরিট...

তারপর এক সময়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন তার ঘুম ভাঙলো দেরিতে। চোখ মেলেই সে পাশের বালিশটার দিকে তাকালো। দীপা যে তার পাশে এসে শুয়েছিল তার চিহ্ন আছে। কিন্তু দীপা উঠে গেছে এরই মধ্যে। যথারীতি রান্না ঘরে সে এখন।

মনীশ ডাকলো, কুশ ! কুশ !

দু'তিনবার ডাকের পর কুশ ঘুম চোখে দরজার কাছে এসে বললো, কী ?

যেন কাল রাত্রে কিছুই হয়নি এইভাবে মনীশ বললো, তোর বৌদির কাছ থেকে টাকা নিয়ে আজ তুই বাজারটা করে নিয়ে আয়। আমার শরীরটা ভালো লাগছে না।

কুশ দুর্বোধ্য একটা শব্দ করে পেছন ফিরতেই মনীশ আবার বললো, আমার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে, তোর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট দিয়ে যা।

কুশ যে সিগারেট খায়, এটা মনীশ এতদিন জেনেও না জানার ভাণ করেছে। আজ প্রথম সে কুশকে স্বীকৃতি দিল।

চায়ের কাপ নিয়ে এসে দীপা জিজ্ঞেস করলো, তোমার শরীর খারাপ লাগছে ? কী হয়েছে ?

মুখে হাসি ফুটিয়ে মনীশ বললো, কিচ্ছু না। এমনিই, আলস্য।

জন্মদিনের প্রতিজ্ঞাটা কিছুতেই আর রাখা যাচ্ছে না। এক এক সময় সত্যি কথাটাও আদিখ্যেতার মতন শোনায়। কিংবা কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে তার সংজ্ঞাটাও নিজেকেই ঠিক করে নিতে হয়।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সে বললো, বাঃ ! কাল রাত্তিরে আমার বোধহয় খানিকটা বকুনি পাওনা ছিল, কিন্তু একটা সুন্দর গানের সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লুম। শাস্তির বদলে পুরস্কার। এখন তুমি আমাকে কিছু বলবে নিশ্চয়ই ?

দীপা হেসে বললো, আমি ঘরে এসে দেখি তুমি দুষ্টু ছেলের মতন উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছো। তখনো নিশ্চয়ই ঘুমোও নি ?

—কী জানি, হঠাৎ কখন ঘুম এসে গেল, টের পাইনি।

—শোনো, তুমি ও-রকম রেগে চেঁচিয়ে কক্ষনো কথা বলবে না, তোমাকে মানায় না।

—আমিও তো মানুষ, আমার রাগ থাকবে না ?

—যুক্তিহীন রাগটা দুর্বলের লক্ষণ !

—তোমার রাগটা কী রকম, দীপা ? তুমি কখনো রাগো না ?

—আমার রাগ যেদিন হবে, সেদিন বুঝবে ! সে বড় সাংঘাতিক। আমার রাগ

যুক্তিহীন। আমি তো তোমার মতন অত লেখাপড়া জানি না!
—দীপা, তুমি গানের চর্চা করো না কেন? বাপের বাড়িতে তোমার নিজস্ব হারমোনিয়াম ছিল...একটা ছোটখাটো হারমোনিয়াম কিনে ফেলতে পারি।
—ধ্যাৎ! হারমোনিয়াম ছাড়া বুঝি গান হয় না! আজকাল সময় পাই কখন?
—বিকেলবেলায় তুমি কোনো গানের স্কুলে ভর্তি হলে পারো।
—গানের ইস্কুলের ডিগ্রি আমার পাওয়া হয়ে গেছে। ওরা আর বেশি কী শেখাবে!
—তা হলে রেডিওতে একটা অডিশান দাও। আমি ফর্ম-টর্মের খোঁজ করবো?
—তুমি ওঠো তো, বিছানাটা তুলতে হবে!
দীপা ইস্কুলে বেরিয়ে যাবার পর মনীশ একবার ভাবলো, আজ সে কলেজে যাবে না। সারা দিনটা শুয়ে শুয়ে কাটাবে! কিন্তু খানিকবাদে তার মনে পড়লো, তিনটের সময় প্রিন্সিপ্যালের ঘরে একটা মিটিং আছে। না গিয়ে উপায় নেই।
শরীরটা ভারি ভারি লাগছে। আজ সব কিছুই তার মন্থর। এক একদিন কোনো কিছুতেই মন লাগে না। স্নান করতে গিয়ে গায়ে জল ঢালার সময় জলের স্পর্শ অনুভব করা যায় না। খাবারে কোনো স্বাদ নেই। পোশাক পরা, বাড়ি থেকে বেরুনো, ভিড়ের বাসে ওঠা, সবই কীরকম যেন যান্ত্রিকভাবে হয়ে যায়। চেনা লোককেও চিনতে পারা যায় না।
পর পর দুটো ক্লাসের পর তার অফ পিরিয়ড। দ্বিতীয়টা কম্বাইনড ক্লাস, একগাদা ছাত্র, কারুরই প্রায় পড়াশুনোয় মন নেই, মনীশকে শুধু শুধু চেঁচিয়ে যেতে হয়। আজকাল আবার অনা অনার্সের ছাত্রদের ইংরিজিটা হয়ে গেছে কমপালসারি অ্যাডিশানাল! সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। পরীক্ষা দিতে হবে, কিন্তু পাশ না করলেও কিছু আসে যায় না। তাহলে আর তারা শুধু শুধু ইংরিজি পড়ে সময় নষ্ট করতে যাবে কেন?
অফ পিরিয়াডে ধীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি একটু লজ্জিতভাব করে বললেন, ভাই মনীশ, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। একটু এ পাশে এসো।
বাথরুমের পাশে ফাঁকা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে তিনি মনীশের কাঁধে হাত রেখে বললেন, তুমি আমার উপকারই করতে চেয়েছিলে। তোমাকে আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত। কিন্তু ভাই একটা মুস্কিলে পড়ে গেছি!
মনীশ দ্রুত চিন্তা করতে লাগলো। চাঁদু কি কোনো গণ্ডগোল করেছে? কিন্তু

চাঁদু তো সেরকম ছেলে নয়। মুখে মুখে কথা বলে না কক্ষনো, প্রচুর খাটতে পারে।
—কী হয়েছে, ধীরেনদা?
—তুমি যে ছেলেটিকে পাঠিয়েছিলে, চন্দ্রনাথ, ছেলেটি এমনিতে ভালোই, কিন্তু ব্রাহ্মণ নয় তো।
মনীশ স্তম্ভিত হয়ে গেল। ধীরেনবাবুর বিদগ্ধ কথা-বার্তা, তর্ক-বিতর্ক শুনে সে কোনোদিন ঘুনাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি যে তাঁর মধ্যে এই সব সংস্কার আছে। অবশ্য ধীরেনবাবুর বাড়িতে সে কোনোদিন যায়নি।
—আপনি কী বলছেন, ধীরেনদা? রান্নার জন্য বামুন, মানে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ চাই?
—না, না, আমার জন্য নয়। আমার স্ত্রী ঐসব মানেন। তা আমি চন্দ্রনাথকে বললুম, তোমার ঐসব কিছুই বলার দরকার নেই। তুমি চুপচাপ কাজ করে যাও। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, ছেলেটির চেহারাটাও তো কীরকম কীরকম।
—তার মানে?
—তুমি রাগ করো না, ভাইটি, আমার স্ত্রী যে বড় অবুঝ! রোগে ভুগে ভুগে আরও দুর্বল হয়ে গেছেন। উনি বললেন, ছেলেটার কীরকম গাঁট্টাগোঁট্টা গুণ্ডার মতন চেহারা, ও কক্ষনো বামুন হতে পারে না, দুপুরে আমি একলা থাকি, না, না, ওকে দেখলেই আমার ভয় হচ্ছে।
—ধীরেনদা, কারুর স্বাস্থ্য ভালো হওয়াটা অপরাধ? চাঁদু অতি নিরীহ স্বভাবের ছেলে।
—আহা-হা, এগুলো তো আমার কথা নয়, আমার স্ত্রীকে কোট করলুম। উনি ভয় পাচ্ছেন, দুপুরে তো ছেলে-মেয়েরা কেউ বাড়িতে থাকে না।
—চাঁদুও তো দুপুরে বেরিয়ে যাবে।
—কোনো ঠিক তো নেই, ও যদি কলেজ কামাই করে কোনোদিন থেকে যেতে চায়।
—অর্থাৎ ওকে রাখবেন না?
—আমি ওকে বুঝিয়ে সব বলে এসেছি। ও আজ এগারোটার মধ্যেই চলে যাবে বলেছে! দেখি আমি যদি পরে ওর জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে পারি।
মনীশের মনে পড়ে গেল বেড়াল পার করার গল্প। ছেলেবেলায় তাদের বাড়িতেই এরকম হয়েছিল। একবার মনীশ খালের ওপারে দুটো বেড়ালছানাকে

রেখে এসেছিল। বেড়াল সহজে জলে নামতে চায় না। তবু বেড়ালদুটো কী করে আবার ঠিকঠাক বাড়িতে ফিরে এসেছিল, সে এক বিস্ময়!

চাঁদু এতক্ষণে বাড়ি পৌঁছে গেছে নিশ্চয়ই। দীপাকে বাড়িতে পাবে। দীপা খুশিই হবে মনে হয়। থাক, চাঁদু থেকেই যাক।

মনীশ তখনই ঠিক করে ফেললো, সে আর একটা টিউশানি নেবে। একবার শুরু করলে থামারই বা কী মানে হয়। কয়েকদিন ধরেই একটি অনার্সের ছাত্র খুব ধরেছে পরীক্ষার আগের ক'টা মাস পড়াতে। দু'শো টাকা রোজগার বাড়বে। বিকেলে কলেজস্ট্রিটের আড্ডা বাদ দিলে বিকেলের দিকেই সময় করে নেওয়া যায়।

এখন আড্ডার চেয়ে টাকাটাই বেশি দরকার।

॥ ৫ ॥

বিডনস্ট্রিটে মনীশ যে বাড়িতে পড়াতে যায়, সেই বাড়িটা বেশ পুরোনো আমলের। এককালের বনেদী বাড়ি, লোহার গেট এখনো আছে কিন্তু দু'পাশের সিংহ দুটির চোখ অন্ধ, নাক উড়ে গেছে। সামনের দেয়াল থেকে বটগাছ উঠে গেছে ছাদ পর্যন্ত।

প্রথম প্রথম এই বাড়ির গেটের সামনে এলেই মনীশের বাচ্চা বেলার কথা মনে পড়তো। ছোট বিষ্টুপুরের সেই রাজবাড়ি। এইরকমই গেটের দু'পাশে সিংহ ছিল। জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে হাটে যাওয়া-আসার পথে মনীশ কয়েকবার সেই বাড়িটা দূর থেকে দেখেছে। সে জানতো, ঐরকম বাড়িতে তাদের মতন মানুষের কোনোদিনই প্রবেশ-অধিকার নেই।

ছেলেবেলার সেই জগৎ থেকে মনীশ এখন অনেক দূরে সরে এসেছে, কিন্তু আসল সিংহের চেয়েও কোনো বাড়ির গেটে সিংহ মূর্তি দেখলে মনীশের গা-টা ছম ছম করে। এসব কথা কারুকে বলা যায় না।

এই বাড়িতে মনীশ্ সুতনুকা নামে একটি মেয়েকে পড়ায়। মেয়েটি খুব চুপচাপ স্বভাবের, পড়াশুনোর বাইরে একটি কথাও বলে না। সে বেশ মেধাবিনী, উঁচু সেকেন্ড ক্লাস পাবেই। এরকম ছাত্রীকে পড়াতে ভালো লাগে।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে একটা লম্বা দালান, এককালে শ্বেত পাথরে বাঁধানো ছিল, এখন অধিকাংশ খোপই ভাঙা। একতলায় পুরোটাই ভাড়া দেওয়া আছে বলে মনীশকে পড়াতে যেতে হয় অন্দরমহলে। সেখানে হুট করে যাওয়া যায় না, মনীশ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ডাকে, নকুল, নকুল!

ছাত্রদের নাম ধরে ডাকলেও ছাত্রীর নাম ধরে ডাকতে কী রকম বাধো বাধো লাগে। নকুল এ বাড়ির খাস ভৃত্য। অনেকটা অভিভাবকদের মতন ভারিক্কী ভাব।

দালান পেরিয়ে একটা ছোট ঘর। এই ঘরের পাশ দিয়ে একটা লোহার ঘোরানো সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে, এটা বোধহয় মেথরদের সিঁড়ি ছিল। এই দিকেও রয়েছে একটা উঠোন, সেটা যে কোন্ কাজে লাগে তা বোঝা যায় না। এই সব বাড়িতে অনেক জায়গাই খালি পড়ে থাকতো। শুধু নিছক একটা প্রয়োজনের ইঁট-কাঠের খাঁচা নয়।

মাইনের অতিরিক্ত, এই বাড়িটিতে এলে মনীশ খানিকটা রোমাঞ্চ উপভোগ করে।

সুতনুকা পড়ার ঘরে নেই, মনীশ একা বসে রইলো কিছুক্ষণ। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চা এসে গেল এক কাপ। এ বাড়িতে কি সর্বক্ষণ গরমজল ফোটে?

একটু বাদে সুতনুকা দরজার সামনে থেকে উঁকি মারলো। সে বাইরে থেকে ফিরলো এই মাত্র, হাতে কয়েকটি প্যাকেট, নতুন জামা-কাপড়ের মনে হয়। পুজোর তো এখনো অনেক দেরি!

এই বোধহয় প্রথম সুতনুকা মনীশের দিকে তাকিয়ে এক ঝলক হেসে বললো, আজ বোধহয় আমার পড়া হবে না!

মনীশ জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কেন, সেটা বদলে বললো, ও।

সুতনুকা বললো, আপনি একটু বসুন। মা আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

পুরোনো বনেদী বাড়ি হলেও সুতনুকার মা পর্দানশীনা নন। মনীশের সঙ্গে তাঁর আগে দু'চারবার কথা হয়েছে, তিনি লেখাপড়া জানা মহিলা, বিয়ের পর এম এ পরীক্ষা দিয়েছিলেন। সুতনুকার বাবা নেই, তার মা-ই পরিবারটি সামলান।

সুতনুকার মায়ের শরীরটা গুরুর দিকে, সেই তুলনায় সুতনুকা ছিপছিপে, লঘু। মায়ের তুলনায় সুতনুকার গায়ের রংটাও চাপা। তবু দু'জনের মুখের আদলে একটা সূক্ষ্ম মিল আছে।

মিনিট পাঁচেক বাদে সুতনুকার মা সুজয়া এসে বললেন, মাস্টারমশাই, একটা ভালো খবর আছে। এই মাসের পঁচিশ তারিখে খুকির বিয়ে ঠিক হয়েছে।

মনীশ যেন কথাটা ঠিক শুনতে পায়নি, কিংবা শুনলেও মর্ম বুঝতে পারেনি। সে জিজ্ঞেস করলো, বিয়ে? কার?

সুজয়া বললেন, খুকির, মানে আপনার ছাত্রীর। এই পঁচিশ তারিখে, হঠাৎ

ঠিক হলো।

মনীশ এটাকে ঠিক ভালো খবর হিসেবে নিতে পারলো না, সে একজন মাস্টার, মাস্টারি চিন্তাটাই তার মাথায় আসে প্রথমে। আর মাত্র দু'মাস বাদে সুতনুকার এম এ পরীক্ষা, তার আগেই বিয়ে হয়ে গেলে পড়াশুনো করবে কী করে?

—তা হলে ও এ বছর পরীক্ষা দেবে না?

—না, তা আর দেওয়া হবে না। ব্যাপার কী হলো জানেন, আমার মামাতো ভাই-এর এক বন্ধু বিলেত থেকে এসেছে। খুকিকে তার খুব পছন্দ। হঠাৎ সব ঠিক হয়ে গেল। ওর তো বেশি ছুটি নেই, বিয়ে করে এই মাসের মধ্যেই বউ নিয়ে লন্ডনে ফিরে যাবে।

মনীশ বললো, ও।

—ছেলেটি খুব ভালো, বুঝলেন, ওখানে বার্মিংহামে—

মিনিট পাঁচেক ধরে তিনি সুতনুকার ভাবী স্বামীর গুণপনার বর্ণনা দিলেন। তিনি বেশি বাড়িয়ে কথা বলেন না, সুতনুকার উপযুক্ত পাত্রই পাওয়া গেছে মনে হলো। মনীশের খুশি হবারই কথা। সে মাঝে মাঝেই বলে যেতে লাগলো, ও, ও, ও!

সুজয়া আবার জিজ্ঞেস করলেন, এখানে খুকির এম এ'টা কমপ্লিট হলো না। লন্ডনে গিয়ে কোর্স নিতে পারবে না?

মনীশ বললো, হ্যাঁ, তা পারবে নিশ্চয়ই।

সুজয়া মনীশের দিকে একটা খাম বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই নিন, এর মধ্যে আর তো ওর পড়া হবে না, কেনাকাটি সব বাকি। আপনাকে পঁচিশ তারিখ আসতে হবে কিন্তু। আপনার স্ত্রীকেও আনবেন। আপনার বাড়িতে কার্ড দিয়ে আসবো।

মনীশ বললো, নিশ্চয়ই আসবো।

—একটু বসুন। আপনাকে একটু মিষ্টি খেতে হবে। ও বাড়ি থেকে অনেক মিষ্টি পাঠিয়েছে।

মনীশ সামান্য আপত্তি জানালেও তা টিকলো না।

এ বাড়িতে শিক্ষকের সম্মান আছে। ঝি-চাকরের হাত দিয়ে মিষ্টি না পাঠিয়ে সুজয়া নিজে নিয়ে এলেন মিষ্টির প্লেট। সুতনুকাও এসে দাঁড়ালো।

টুকটাক গল্প করতে করতে মিষ্টি খাওয়া শেষ হলো। তারপর জলের গেলাসে চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই মাথাটা ঘুরে গেল মনীশের। চোখের সামনে একটা

কালো পর্দা। ঝুপ করে সে পড়ে গেল মাটিতে।

ঠিক সাত মিনিট বাদে মনীশের জ্ঞান ফিরলো। চোখ মেলে সে দেখলো তিন চার জন নারীর উদ্বিগ্ন মুখ। তার জামা জলে ভেজা। সুতনুকা একটা স্মেলিং সল্টের শিশি ধরে আছে তার নাকের কাছে।

মনীশ একেবারে মরমে মরে গেল। কী হয়েছিল তার? এরকম একটা বিশ্রী নাটকীয় ব্যাপার...।

সে ধড়মড় করে উঠে বসলো। তারপর বললো, আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি! কী যে হলো জানি না!

উদ্বিগ্ন নারীরা বললো, না, না, না, আপনি এখন উঠবেন না, বসুন। মাথা ঘুরে গেসলো, ভাগ্যিস কাচের গেলাসটা চোখে লাগেনি। আপনার কি মৃগী আছে?

মনীশ বললো, আগে তো কখনো এরকম হয়নি।

মহিলাদের নিষেধ সত্ত্বেও মনীশ উঠে দাঁড়ালো। তার মাথাটা এখনও টল টল করছে বটে, কিন্তু সে আর এখানে এক মুহূর্ত থাকতে চায় না।

—ছি ছি ছি, আপনাদের অসুবিধে করলুম।

—না, না, ও কথা বলছেন কেন? আমরা তো চিন্তায় পড়ে গেসলুম, এতক্ষণ জ্ঞান ফিরছে না! ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি। আপনি বসুন।

মনীশ বললো, না, তার কোনো দরকার নেই। আমি এখন ঠিক হয়ে গেছি। হঠাৎ কী যে হয়ে গেল!

সুজয়া দৃঢ়ভাবে বললেন, না, ডাক্তার না দেখিয়ে আপনার যাওয়া চলবে না। অসুখ-বিসুখের ব্যাপারে অবহেলা করতে নেই।

—আমি বেরিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে নেবো কোথাও!

শেষ পর্যন্ত একটা রফা হলো। এ বাড়ির সামনে, রাস্তার ঠিক উল্টো দিকেই এক ডাক্তারের চেম্বার আছে। এ বাড়ির প্রধান ভৃত্য নকুল সেখানে পৌঁছে দেবে মনীশকে।

সুতনুকা নকুলকে নির্দেশ দিল, চেম্বারে যদি ভিড় থাকে, তা হলে তুমি ডাক্তারবাবুকে বলবে ইনি আমার মাস্টারমশাই। এঁকে আগে দেখে দিতে হবে।

বিদায় নেবার জন্য মনীশ সবার দিকে তাকালো। সুতনুকা তার দিকে চেয়ে আছে গাঢ় চোখে।

মনীশ লাজুকভাবে বললো, যাই!

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে লজ্জায় তার মরে যেতে ইচ্ছে হলো। ছি ছি ছি,

ওঁরা কী ভাবলেন ? টিউশানিটা চলে গেল কিংবা সুতনুকার বিয়ের খবর পেয়েই তার মাথা ঘুরে গেল ?

মোটেই সেরকম কিছু না। সুতনুকার সঙ্গে তার স্ট্রিকটলি অধ্যাপক-ছাত্রীর সম্পর্ক। দু'বছর ধরে পড়াচ্ছে, কোনোদিন একটা বেচাল কথা হয়নি। একটা টিউশানি চলে গেলেই বা কী, মনীশ তৃতীয় একটা নিয়েছে গত মাস থেকে, নতুন আর একটা জোগাড় করাও তার পক্ষে মোটেই শক্ত নয়।

নকুল তার হাত ধরে আছে। মনীশ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একাই রাস্তা পার হলো। যদিও তার পা দুটি বেশ দুর্বল, আবার সে মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারে। মৃগী ? এপিলেপসি ? নাকি সেই হারামজাদা বায়ুর উপদ্রব ? মনীশ শুনেছে যে বায়ুর চাপেও নাকি অনেক সময় মানুষ মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে যায়।

ডাক্তারের চেম্বারে পাঁচ ছ'জন রুগী অপেক্ষা করছে, নকুল তবু মনীশকে নিয়ে জোর করে ভেতরে ঢুকে গেল। ডাক্তার বললো, হ্যাঁ। এর জন্যই তো কল দেওয়া হয়েছিল ? আমি যাচ্ছিলুম, আর দু'এক মিনিটের মধ্যেই...

ডাক্তারটি বেশ ভদ্র ও নম্রভাষী। মুখ দেখলে ভালো লাগে। তিনি অন্য একজন পেশেন্টকে পরীক্ষা করছিলেন। তা থামিয়ে তিনি মনীশকে জিজ্ঞেস করলেন, এখনো শরীর খারাপ লাগছে ?

মনীশ বললো, সেরকম কিছু না। তবে মাথাটা রীল করছে।

ডাক্তার একটা ফাইল থেকে একটা ছোট্ট সাদা ট্যাবলেট বার করলেন। তারপর সেটাকে আবার আধখানা করে ভেঙে এক টুকরো মনীশকে দিয়ে বললেন, এটা জিভের তলায় রেখে দিন, চিবোবেন না। দেখুন, এতে কোনো উপকার পান কি না, তারপর আমি দেখছি।

একটু পরে অন্য রুগীটিকে ছেড়ে দিয়ে তিনি মনীশকে ভালো করে পরীক্ষা করলেন। প্রায় সাত আট বছর মনীশের শরীরে কোনো চিকিৎসকের স্পর্শ লাগেনি। অসুখ নিয়ে বাড়াবাড়ি সে পছন্দ করে না। মানুষের শরীর থাকলে মাঝে-মধ্যে একটু-আধটু গোলমাল হবেই। মনীশ নিজেই নিজের চিকিৎসা করে। তার ছোট ভাই কৃশের বরং অসুখ-বিসুখ নিয়ে বড্ড আওপাতালি আছে।

ডাক্তারটির মুখ চিন্তিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আগে প্রেসার মাপিয়েছেন কখনো ?

মনীশ বললো, না।

—এরকম চোখে অন্ধকার দেখা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া আগে কতবার হয়েছে ?

—মাঝে মাঝে কয়েক সেকেন্ডের জন্য অন্ধকার হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আগে বেশ কয়েকবার হয়েছে। বুকেও ব্যথা হয়। কিন্তু অজ্ঞান হয়ে যাইনি কখনো।

—আমার কাছে ই সি জি করার মেশিন নেই। আপনার হার্টটা একবার পরীক্ষা করা দরকার। আপনি একজন হার্ট স্পেশালিস্টকে দেখিয়ে নিন বরং।

—হার্টের রোগ ? এই বয়েসে হয় !

—খুব একটা স্বাভাবিক নয়। আপনার বয়েস তো বেশি না, তবে, সব বয়েসেই হতে পারে, বাচ্চাদেরও থাকে কখনো কখনো, কনজেনিটাল ডিজঅর্ডার থাকতে পারে।

—আচ্ছা, গ্যাস থেকে এরকম হতে পারে না !

—তাও হতে পারে। অনেক কিছু থেকেই হতে পারে। হয়তো আপনার সিরিয়াস কিছুই হয়নি। তবু একবার দেখিয়ে নেওয়া ভালো। আমি একজন স্পেশালিস্টের নাম লিখে দিচ্ছি।

—আপনি কোনো ওষুধ দেবেন না ?

—এখন আর কিছু দরকার নেই। আগে চেকআপ করিয়ে নিন না। ই সি জি করান, ব্লাড টেস্ট করান, তাতে কিছু না পাওয়া গেলে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন।

ডাক্তার ফি নিলেন মাত্র কুড়ি টাকা। নিশ্চয়ই উল্টোদিকের বাড়ির সঙ্গে তাঁর খাতির আছে।

রাস্তায় বেরিয়ে মনীশ বেশ চাঙ্গা বোধ করলো।

এখন স্পেশালিস্ট দেখাতে গেলে বহু খরচের ধাক্কা। বিধান রায় নাকি রুগীদের মুখ দেখেই কী অসুখ বলে দিতে পারতেন। আজকালকার স্পেশালিস্টরা হাজার রকম টেস্ট করাবার আগে মুখ খোলেন না। এসব মনীশের হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট সত্যেন ঘোষালের কাছ থেকে শোনা। তাঁর হার্টের দোষ আছে, কিন্তু গত কুড়ি বছর ধরে তিনি নাকি কোনো ওষুধ না খেয়ে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন।

মনীশের এখন সামনে অনেক খরচের চিন্তা। দীপা তার গর্ভ নষ্ট করতে রাজি হয়নি, তাদের প্রথম সন্তান আসছে। দীপার জন্যই ডাক্তারদের পেছনে বহু টাকা ঢালতে হবে। মনীশের এখন স্পেশালিস্ট দেখাবার বিলাসিতা চলে না।

কনজেনিটাল ডিজঅর্ডার না ছাই ! তা হলে মনীশ এতদিন ধরে দৌড়-ঝাঁপ করছে, ভিড়ের ট্রাম-বাসে ঠেলাঠেলি করছে প্রতিদিন, এর মধ্যে কোনোদিন তো সে অজ্ঞান হয়ে যায়নি। মৃগী-টৃগীও নয়, স্রেফ গ্যাসের ব্যাপার।

শরীরটা এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে। কোনো অসুবিধে নেই। এরকম কী করে হলো ? ডাক্তার যে ছোট্ট একটা ট্যাবলেটের আধখানা দিলেন, সেটা জিভের তলায় রাখার পর থেকেই মনীশ সুস্থ বোধ করতে শুরু করেছে। এটুকু ওষুধের এতখানি গুণ ? মনীশ ওষুধের ফাইলে নামটা দেখে নিয়েছে। সরবিট্রেট। ঐ ওষুধ এক ফাইল কিনে রাখতে হবে। তাতেই গ্যাস-ফ্যাস সব হওয়া হয়ে যাবে।

ডাক্তারের সুপারিশ-পত্রটা পকেটে রাখা নিরাপদ নয়। দীপা দেখলেই ঝঞ্ঝাট করবে।

কাগজটা পকেট থেকে বার করে মনীশ মুড়ে ফেলে দিল রাস্তায় এক কোণে। সরবিট্রেট ! সরবিট্রেটই যথেষ্ট !

সুতনুকা কি ভেবেছে যে তার বিয়ের খবর শুনেই মনীশের এরকম প্রতিক্রিয়া হলো ? অনেকক্ষণ বাদে হাসি ফুটে উঠলো মনীশের ঠোঁটে।

বাড়ি ফিরেই সে শুনলো, কুশ কোথা থেকে মাথা ফাটিয়ে ফিরেছে। ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল তার জন্য, তিনটে স্টিচ করতে হয়েছে তার মাথায়।

যাদবপুর বাস স্ট্যান্ডের কাছে দু'দলের মারামারির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল কুশ, তাতেই সে হঠাৎ চোট পেয়েছে মাথায়। দীপাকে সে এই গল্প শুনিয়েছে।

কিন্তু মনীশ শুনেই বুঝতে পারলো, এটা কলেজ ইউনিয়ানের ঝগড়ার ব্যাপার।

ছোট ভাইকে মনীশ নিজের কলেজেই ভর্তি করেছে, যাতে অন্তত হাফ ফ্রি পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বক্ষণ সে দাদার চোখের সামনে থাকতে চায়নি। তাই সে কায়দা করে ঐ কলেজেরই সাউথ ক্যালকাটা ব্রাঞ্চে ট্রান্সফার নিয়ে এসেছে। তার যুক্তি ছিল, এতে তার যাওয়া-আসার ভাড়া কম লাগবে। আজ দুপুরেই মনীশ খবর পেয়েছে যে তাদের সাউথ ক্যালকাটা ব্রাঞ্চে দুটি ইউনিয়ানের মধ্যে মারামারি হয়েছে।

দীপা মনীশের হাত ধরে শয়নঘরে নিয়ে এসে মিনতি করে বললো, আজ তুমি ওর ওপর রাগ করো না, প্লীজ ! প্রচুর রক্ত বেরিয়ে গেছে, বেচারার জ্বর এসে গেছে।

না, মনীশের রাগ হচ্ছে না, তার বদলে জাগছে হতাশা। দিদি-জামাইবাবুর গ্রাম থেকে কুশকে সরিয়ে এনে তা হলে কী লাভ হলো ? কলকাতা আরও সাংঘাতিক জায়গা। একবার হিংস্র রাজনীতির মধ্যে ঢুকলে আর বেরিয়ে আসার পথ নেই।

কুশ এইরকম একটার পর একটা গোলমাল করেই চলবে। দুশ্চিন্তা বাড়তেই থাকবে তাকে নিয়ে। অথচ মনীশ বাড়িতে শান্তি চায়। সারাদিন রুজি রোজগারের জন্য মুখের রক্ত তুলতে হয়, বাড়িতে ফিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে কি নিশ্চিন্তে বই-টই পড়তে পারবে না ?

তা ছাড়া মনীশকে এবারে রিসার্চের কাজ শুরু করতে হবে। পি-এইচ ডি না হলে সে লেকচারারের পোস্টেই আটকে থাকবে। এখন নতুন নতুন ছেলেরা কলেজে পড়াতে আসছে আগে থেকেই পি-এইচ ডি নিয়ে। বাড়িতে এই সব উৎপাত চললে কি গবেষণার কাজে মন দেওয়া যাবে !

মনীশ বললো, আচ্ছা, আমি ওকে বকবো না। কিন্তু তুমি ওকে একটা কথা বলে দিতে পারবে ?

—কী ?

—আজকাল ইউনিয়ানের ছেলে-ছোকরাদের কিচ্ছু বলা যায় না, তারা যা খুশি করে। পকেটে বোমা নিয়ে ক্লাস করতে এলেও আমরা চুপ করে থাকি। কিন্তু আমার নিজের ভাই যদি ইউনিয়ানবাজি আর বোমাবাজি করে, তাহলে কলেজ কর্তৃপক্ষ আমার ওপর চাপ দেবে। আমার চাকরি করা মুস্কিল হবে।

—ঠিকই তো। এ কথা আমি ওকে নিশ্চয়ই বলবো।

—তোমার কথা ও শুনবে ?

—বুঝিয়ে বললে বুঝবে না কেন ? পলিটিক্স করতে চায় বাইরে করুক, আগে অন্তত পার্ট টু-টা পাশ করে নিক।

—দ্যাখো চেষ্টা করে !

মনীশ জামা-টামা না ছেড়েই শুয়ে পড়লো খাটে।

দীপা কাছে এসে বললো, তুমি ওকে একবার দেখতে যাবে না ? গিয়ে দু'একটা কথা-টথা বলো !

—যাচ্ছি একটু পরে।

—তোমার মুখটা এত শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন ? তোমার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি ?

—না।

দীপা মনীশের কপালে হাত রাখলো। মেয়েদের এখনো এই ধারণা যে, শরীর খারাপের একমাত্র লক্ষণ জ্বর।

কেন যেন দীপার ওপর মনীশের হঠাৎ খুব অভিমান হলো। হতাশা থেকেই এই অভিমান ? কেন দীপা তার ভেতরটা দেখতে পায় না ?

এখন সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে না, অথচ পকেটে সিগারেট আছে। দীপা রান্না ঘরে গেছে তাই চুপচাপ ছাদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকা যায়। ঘুরন্ত পাখা, ওর প্রত্যেকটা ব্লেড আলাদা আলাদাভাবে চেনাটা যেন এখন মনীশের পক্ষে খুব জরুরি।

প্রেম, বিয়ে, সংসার, এই সবের কী মানে আছে? এর থেকে আগে, মেসে থাকার সময় মনীশ তো মোটেই খারাপ ছিল না! মাঝে মাঝে দীপার সঙ্গে দেখা হতো লুকিয়ে-চুরিয়ে, একটু-আধটু ছোঁয়াছুঁয়ি, কত তীব্রতা ছিল তার মধ্যে!

কিন্তু সারাটা জীবন বোধহয় সেভাবে চলে না। সংসার পাততে হয়, রোজগার বাড়াবার চেষ্টা চালাতে হয়। ভালোবাসায় ঘেরা দুর্লভ প্রতিমার মতন যে স্ত্রী, তার কাছেও গোপন করতে হয় অনেক কিছু।

নাঃ, এত নৈরাশ্য ভালো নয়। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লো মনীশ।

পাশের ঘরে এসে দেখলো একটি অপূর্ব দৃশ্য। মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে শুয়ে আছে কুশ, কপালে জলপট্টি। চাঁদু এক হাতে একটা হাত পাখা দিয়ে হাওয়া করছে তাকে, আর এক হাতে একটি খোলা-বই। গল্পের বই নয়, কলেজ-পাঠ্য বই। সে মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। কী নিষ্ঠা। কিন্তু মনীশ জানে, কুশ বা চাঁদু কেউই এক চান্সে বি এ পাশ করতে পারবে না।

স্নেহ দেখাবার একমাত্র ভঙ্গি হিসেবে মনীশও কুশের কপালে হাত রাখলো।

কুশ চোখ মেলে তাকালে সে বললো, আজ তুই আর চাঁদু ও ঘরে পাখার তলায় গিয়ে শো। দীপা আর আমি এ ঘরে থাকবো।

কুশ বললো, না, না, তার দরকার নেই।

—কেন, আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না!

—না, দাদা, আমার বেশি গরম লাগছে না। এই চাঁদু, আর হাওয়া করতে হবে না তোকে।

—তুই এ টি এস ইঞ্জেকশান নিয়েছিস?

—না।

—সে কি। ডাক্তার বলেনি কিছু? কলকাতার ধুলোবালি মানেই তো বিষ। চাঁদু, তুই কাল সকালেই আবার ওকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাবি। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ঐ ইঞ্জেকশান না নিলে টিটেনাসের ভয় থাকে।

মনীশের বয়েস বত্রিশ কিন্তু কুশ আর চাঁদুর সামনে এলেই সে অনেক বেশি বয়স্ক হয়ে যায়। গলায় ভারিক্কী সুর আসে। হেড অফ দা ফ্যামিলি বলে কথা।

খাওয়া-দাওয়া চুকে গেল সংক্ষেপে।

মনীশ আর দীপা চুপচাপ শুয়ে আছে পাশাপাশি। এক সময় দীপা বললো, দু'তিন দিন ধরে লক্ষ্য করছি, তুমি খুব কম কথা বলছো। তোমার কী হয়েছে বলো তো?

—কই, কিচ্ছু হয়নি তো?

—কোনো কারণে তোমার মেজাজ খারাপ হয়েছে?

—কই না তো!

মনীশ সরে এসে দীপার পেটে হাত রাখলো। সেখানকার কাপড় সরিয়ে, শায়ার গিট খুলে দিয়ে মনীশ তার কানটা চেপে ধরলো।

—কই শব্দ হচ্ছে না তো?

দীপা বললো, মাঝে মাঝে নড়াচড়া করে। একটু আগেও করছিল।

—আমি টের পাই না কেন?

—এবার নড়াচড়া করলে তোমায় ডাকবো। তুমি বাড়িতে এত কম সময় থাকো!

—দীপা, কী হবে, ছেলে না মেয়ে? তোমার কোনটা ইচ্ছে?

—আমার ইচ্ছে শুনলে তুমি রেগে যাবে! আমার ইচ্ছে মেয়ে।

—কেন, রাগবো কেন? আমি-ও তো মেয়েই চাই। মেয়েরাই ভালো। ছেলেগুলো সব শুয়োরের বাচ্চা হয়!

দু'জনেই হেসে উঠলো এক সঙ্গে।

মনীশ মাথাটা সরিয়ে নিয়ে দীপার ফর্সা, নগ্ন, নিম্নপেটে একটা হাত রাখলো। তারপর বললো, তুমি স্কুলের চাকরিটা ছেড়ে দাও!

—ছেড়ে দেবো?

—ব্যাটারা তোমাকে এখনো পার্মানেন্ট করলো না। ঝুলিয়ে রেখেছে। তোমার এখন বিশ্রাম দরকার। তা ছাড়া অন্তত ছ'মাস তো ছুটি নিতেই হবে। সে ছুটি ওরা দেবে না! তার চেয়ে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

—ছাড়বো--টাকা পয়সার কী হবে?

—সে আমি দেখবো। সে চিন্তা তোমায় করতে হবে না। তোমার এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। একটা কাজের লোকও রাখতে হবে।

—দাঁড়াও দাঁড়াও, অত ব্যস্ত হচ্ছো কেন, আরও দু'তিন মাস যাক।

—তুমি কাল থেকে আর রান্না ঘরে ঢুকো না। আমরা তিন জনেই সব ম্যানেজ করে নেবো!

—আরে, তুমি জানো না, এই সময় বেশি কাজ করতে হয়। ডাক্তাররা বলে,

ঘর মোছা, বাসন মাজার কাজ বেশি করে করলে খুব স্মুথ ডেলিভারি হয়।
—ভ্যাট, বাজে কথা।
—বিশ্বাস হচ্ছে না? তুমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করো।
—আর কয়েক মাসের মধ্যে আমি বাবা হয়ে যাবো, অ্যাঁ? এখনো যেন বিশ্বাসই করতে পারছি না।
—তুমি তখন গোঁপ রেখো। তখন তোমায় বেশ বাবা বাবা দেখাবে।
বিছানার একটু দূরে গড়িয়ে গিয়ে মনীশ বললো, এই বাড়িটা এবারে ছেড়ে দেবো। এর পরে একটা বড় বাড়িতে যাবো।
—কী ব্যাপার, তুমি লটারির বাম্পার প্রাইজ পাচ্ছো মনে হচ্ছে?
মনীশ ক্লান্তভাবে বললো, এত ছোট জায়গায় থাকতে আর আমার ভালো লাগে না। আমার অন্য কোনো জায়গা, খুব বড় কোনো জায়গায় চলে যেতে ইচ্ছে করে।

॥ ৬ ॥

ছুটির দিনগুলি ছাড়া অন্যান্য দিন দীপা বাড়িতে একাই থাকে। দুপুরে তার ঘুমের অভ্যেস ছিল না, কিন্তু এখন তো তার শরীরে দুটি আত্মা, তাই বোধহয় জীবনচর্যার পরিশ্রম বেশি। যখন তখন চোখ বুঁজে আসে।
ইদানীং চাঁদু প্রায়ই দুপুরে বাড়ি ফিরে আসছে। এগারোটার সময় কলেজে যাবার জন্য সে বেরোয়, এক ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টা বাদে সে ফিরে আসে। কোনোদিন সে বলে যে কলেজে স্ট্রাইক, কোনোদিন বলে, ক্লাস করতে ইচ্ছে করছে না। বাড়িতে বসে পড়বে। একদিন সে ফিরলো সারা জামায় কাদা লাগিয়ে, কোনো গাড়ির চাকা তাকে এমন ভূত বানিয়ে দিয়েছে, এই অবস্থায় কলেজ যাওয়া যায় না।
দীপার খটকা লাগে।
কুশ তার সঙ্গে যতটা মন খুলে কথা বলে, চাঁদু ততটা নয়। চাঁদুর বেশ চাপা স্বভাব।
দুপুরে বাড়ি ফিরে এসে চাঁদু নিজের ঘরেই চুপ করে বসে থাকে। আগে সে দীপার ঘরে পাখার তলায় বসতে চাইতো, দীপা শেষ পর্যন্ত ওকে নিষেধ না করলেও চাঁদু নিজেই কিছু বুঝতে পেরেছে, সে আর আসে না। অবশ্য এখন বর্ষা নেমে গেছে, তেমন গরম আর নেই।
বেশ কয়েকটা দিন লক্ষ্য করার পর একদিন দুপুরে দীপা ডাকলো, চাঁদু, শুনে যাও!

পাশের ঘর থেকে চাঁদু উত্তর দিল, কী বলছেন বৌদি?
দীপা বললো, এ ঘরে এসো, শুনে যাও!
এ বাড়ির পুরুষেরা বাড়িতে খালি গায়ে থাকে। দীপাদের নিজেদের বাড়িতে অন্য নিয়ম ছিল। বাবা-জ্যাঠামশাইদের কথা আলাদা, কিন্তু বাড়ির অন্য পুরুষেরা গায়ে অন্তত একটা গেঞ্জি পরে থাকবেই। বিশেষত মেয়েদের সামনে। ও বাড়িতে ঠাকুর-চাকরদেরও কখনো খালি গায়ে দেখা যেত না।
দীপা অবশ্য মনীশদের বাড়ির নিয়মটা মেনে নিয়েছে। এরা গ্রামের ছেলে, বেশিক্ষণ গায়ে জামা রাখা অভ্যেস নেই। কুশ তো দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে জামা খুলতে শুরু করে।
চাঁদুর খাঁজকাটা বুক, প্রশস্ত কাঁধ, সরু কোমর। গায়ের রং ছাতাকেও লজ্জা দেয়। মুখখানা চৌকো ধরনের। কিন্তু মুখখানা যেন পলিমাটি মাখা মনে হয়। এই ক'মাসেও গ্রাম্য সরলতা ঝরে যায়নি।
—কী ব্যাপার চাঁদু, রোজ রোজ বুঝি কলেজ বন্ধ থাকে? তা হলে তোমার দাদা বা কুশ, ওরা যায় কোথায়?
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দরজার কাঠে আঁচড় কটতে কাটতে চাঁদু বললো, আমার আর কলেজে যেতে ভালো লাগে না, বৌদি!
—সে কি? কেন?
—কী জানি, আমার মন বসছে না! আমার বাড়িতে থাকতেই ভালো লাগে।
—বাড়িতে থাকতে ভালো লাগে? তুমি পড়াশুনো করবার জন্য কলকাতায় আসো নি? নাকি আমাদের রেঁধেবেড়ে খাওয়ানোটাই তোমার একমাত্র কাজ!
—আমি ভাবছি গ্রামে ফিরে যাবো!
—কী ব্যাপার, সত্যি করে বলো তো! ভেতরে এসো, এখানে এসে বোসো!
ঘরে ড্রেসিং টেবল নেই, শুধু একটা দেয়াল আয়না আছে, তার সামনে একটা ছোট টুল, সেটাই দীপার প্রসাধনের জায়গা। চাঁদু এসে বসলো সেই টুলে।
দীপা খাটের ওপর বসে আছে বালিশে হেলান দিয়ে, পা দুটি সামনে ছড়ানো, তার মাথার চুল খোলা। তার কাটা কাটা মুখখানা ইদানীং ভরাট ও টসটসে হয়েছে।
—কী হয়েছে কলেজে?
—আমার ভালো লাগছে না, বৌদি। কলেজে আমার একজনও বন্ধু হয় নি। ক্লাস লেকচার সব ফলো করতে পারি না।
—এসব কথা তোমার দাদাকে বলেছো?

—দাদা ব্যস্ত থাকেন, তাই দাদাকে আর বিরক্ত করতে চাই না। গ্রামে থাকতে সুধীরদার কাছে পড়া বুঝে নিতাম, কিন্তু এখানে কে আমাকে বুঝিয়ে দেবে ?

—তোমার দাদা কমার্সের পড়া বোঝাতে পারবে না। কিন্তু কোনো বন্ধু-টন্ধুকে বলে ব্যবস্থা করে দিতে পারে। তোমার দাদাকে তোমার অসুবিধের কথা বলা উচিত ছিল ! এরকম ভাবে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে চলবে ?

—নাঃ বৌদি, আমার আর কলেজে পড়া হবে না। আমাকে গ্রামেই চলে যেতে হবে।

—তাহলে তোমার পড়াশুনো করার ইচ্ছে নেই ? সব সময় তো বই খুলে বসে থাকতে দেখি !

—পড়ার ইচ্ছে তো ছিল। সুধীরদার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, বি-এ পাশ না করে গ্রামে ফিরবো না।

—তবে ?

—কলেজে আমার পাঁচ মাসের মাইনে বাকি। নোটিস দিয়েছে !

এই কথা শুনে দীপা নিজেই অপরাধী বোধ করলো। এই দিকটা তো আগে চিন্তা করা হয়নি। চাঁদুকে এ বাড়িতে থাকতে আর খেতে দেওয়াটাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছিল। সে এসেছিল তিনশো টাকা সম্বল করে। তারপর কেটে গেছে সাত মাস। চাঁদুর মাত্র একটি ধুতি আর দুটি জামা ছিল। তাকে ধুতি কিনতে হয়েছে, চটি কিনতে হয়েছে, কলেজে যাওয়ার জন্য একটু ভদ্রগোছের পোশাক তো লাগেই। সংসারের জন্যও সে কিছু কিছু খরচ করেছে মাঝে মাঝে। তিন শো টাকা উড়ে যেতে ক'দিন লাগে ?

ছেলেটাই বা মুখফুটে কিছু বলবে না কেন ? সব দিকে কি খেয়াল রাখা যায় ? কুশ নিজের জন্য কিছু কিছু হাত খরচ নিজেই জোগাড় করে, চাঁদু তা পারে না !

দীপা মাথার কাছে বিছানাটা একেবারে উল্টে দিল। তোষকের একেবারে নিচে একটি খাঁকি খামই তার সেফ ডিপোজিট ভল্ট। আপাতত খামটি বেশ পাতলা। তার থেকে একটি একশো টাকার নোট বার করে দিয়ে বললো, এই নাও, এতে যা হয় করো। কালই কলেজে জমা দেবে !

চাঁদু কাঁচুমাচু হয়ে বললো, বৌদি, আপনি... না, না, থাক, আপনি কেন দেবেন ?

দীপা কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বললো, এরপর আবার এক সঙ্গে পাঁচ মাসের

মাইনে জমালে আমি আর দিতে পারবো না। প্রত্যেক মাসেরটা প্রত্যেক মাসে চাইবে !

চাঁদু মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইলো। হঠাৎ দেখলে মনে হয় খুব বড়সড় চেহারার একটি অতি শিশু। হঠাৎ দীপার বুকে একটা মায়ার ঝাপটা লাগলো।

খাট থেকে নেমে এসে সে চাঁদুর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে খুব নরম ভাবে বললো, তোমার গ্রামের জন্য মন কেমন করে,তাই না ? সামনের পুজোর ছুটিতে একবার ঘুরে এসো গ্রামে। আমি ভাড়া দিয়ে দেবো !

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো চাঁদু।

চমকে উঠে দীপা বললো, আরেঃ, কী হলো ? এতবড় ছেলে কাঁদে নাকি ? এই চাঁদু, কী হয়েছে ?

দীপার হাত চেপে ধরে অশ্রুসজল কালো মুখখানি তুলে চাঁদু বললো, বৌদি, আমার সঙ্গে এরকম ভালো ব্যবহার জীবনে কেউ করে নি ! সবাই আমাকে...

আর কিছু কথা বলতে পারলো না, চাঁদু তার মুখখানা চেপে ধরলো দীপার উরুতে।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু সরে এসে দীপা বললো, আর কাঁদতে হবে না, চোখ মুছে ফেলো ! চাঁদু, তোমাদের গ্রামটা খুব সুন্দর, তাই না ? সরবাদা নাম শুনলেই মনে হয় অনেক জল আছে। আমি কখনো গ্রাম দেখিনি।

এবারে বেশ উৎসাহিত হয়ে চাঁদু বললো, হ্যাঁ বৌদি, খুব সুন্দর। আপনি যাবেন একবার ?

—তোমার কে কে আছেন গ্রামে ?

—সেরকম নিজের বলতে কেউ নেই। মা মরে যাবার পর... এক পিসতুতো দাদার বাড়িতে থাকতুম... কিন্তু আপনি গেলে সবাই খাতির করবে !

—কেন, আমাকে খাতির করবে কেন ?

—মনীশদাকে ওদিকে অনেকেই চেনে। তাছাড়া, আপনার মতন সুন্দর মেয়েছেলে তো আমাদের গ্রামে কোনোদিন যায়নি !

—এই, মেয়েছেলে আবার কী ? মহিলা বলতে পারো না !

—ও, ভুল হয়ে গেছে ! আমাদের গ্রামের সবাই ঐরকম বলে তো...

—শহরেও অনেকে বলে, কিন্তু বলাটা ঠিক নয়।

—কবে যাবেন বৌদি ? সামনের মাসে ? ও না, আমাদের ভাইপো আসুক আগে, তার আগে তো যেতে পারবেন না !

দীপা খিলখিল করে হেসে উঠে বললো, ভাইপো ? তুমি আগে থেকেই ধরে নিয়েছো যে ভাইপো আসছে ? ভাইঝি নয় ?

—ও আমি ঠিক জানি !

একটু পরে দীপা বললো, যাও, পড়তে বসো গিয়ে। কাল থেকে ঠিক কলেজে যাবে। আমি এখন একটু ঘুমোবো।

চাঁদু চলে যাবার পর খাটে শুয়ে দীপা কয়েকবার হাই তুললো। ঠিক ঘুম নয়, এক ধরনের আলস্যে চোখ বুজে আসছে !

চাঁদু ছেলেটা সত্যি খুব সরল। সামান্য একটু চুলে হাত দিয়ে আদর করতেই কেঁদে ফেললো। দীপার আগে ধারণা ছিল, মেয়েরাই বুঝি কাঁদে। পুরুষদের চোখে সহজে জল আসে না। কিন্তু এখন সে দেখছে, কুড়ি একুশ বছরের ছেলেদেরও একটু সেন্টিমেন্টে ঘা দিলেই চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ে। কুশও কাঁদে মাঝে মাঝে।

চাঁদু যখন হাতটা চেপে ধরলো, একটু জোরে চেপে ধরেছিল না ? কিংবা যখন উরুতে মাথাটা ঠেকালো···। না, এটা বোধহয় দীপার মনের ভুল। বেচারার খুব মন খারাপ ছিল।

পরদিন দুপুরেও চাঁদু ফিরে এলো সাড়ে বারোটার মধ্যে।

যতখানি বিস্মিত, ঠিক ততখানিই বিরক্ত হয়ে দীপা জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার, তুমি আজও কলেজে গেলে না ?

চাঁদু ভীতু ভীতু মুখ করে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললো, আজ যাওয়া হলো না, কালকে যাবো !

—আজ গেলে না কেন, বললুম যে তোমায় মাইনে দিয়ে আসতে ?

—কালকে দেবো। ঠিক দেবো !

—কালকে কালকে বলছো, আজ গেলে না কেন সেটা জানতে চাইছি !

—আজ যে চটিটা ছিড়ে গেল, কী করে খালি পায়ে যাই ?

চাঁদু পকেট থেকে একশো টাকার নোটটা বার করলো এবং ডান পায়ের চটিটা দেখালো। স্ট্র্যাপটা ছিড়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু এমন নয় যে মুচি দিয়ে সারানো যায় না !

দীপা খানিকটা উষ্মার সঙ্গে বললো, কলকাতা শহরে কি মুচি নেই, এটা সারিয়ে নিতে পারোনি ?

—তুমি বিশ্বাস করো বৌদি, বাসে উঠতে গিয়ে একজন চটিটা ছিড়ে দিল। তারপর একঘন্টা খোঁজাখুজি করলুম, একটাও মুচি দেখতে পেলুম না। তাই

চলে এলুম বাড়িতে। কাল ঠিক যাবো।

—তাই যেও !

দীপা চলে এলো নিজের ঘরে। তার দৃঢ় সন্দেহ হলো, চাঁদুর কলেজে না যাওয়ার অন্য কোনো কারণ আছে।

একটু পরেই বৃষ্টি নামলো। বেশ জোর বৃষ্টি। বাথরুমের পাশটায় খানিকটা জায়গা ফাঁকা, সেখান দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসে, শোওয়ার ঘরেও চলে আসে। দীপা দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ঘুম আসছে না। সে একটা ম্যাগাজিন পড়ছে, খানিক বাদে ঠক ঠক শব্দ হলো দরজায়। ভুরু দুটো কুঁচকে গেল দীপার।

দু' তিনবার শব্দ হবার পর দীপা উঠে গিয়ে দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার ?

আজও খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে চাঁদু। অতবড় শরীরটাকে সে যেন বিনয়ে, সঙ্কোচে ছোট করে ফেলতে চাইছে !

সে বললো, বৌদি, তুমি আমায় ডাকলে ?

—কই না তো ?

—ডাকোনি ?

—নাঃ ! আমি তো বই পড়ছিলুম !

—ঠিক মনে হলো তুমি আমায় ডাকলে !

চাঁদু এখন সোজা তাকিয়ে আছে দীপার মুখের দিকে। তার চোখের যেন পলক পড়ছে না।

বেশ কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল ঐভাবে। তারপর দীপা বললো, না, আমি তোমাকে ডাকিনি। আমি এখন ঘুমোবো।

যদিও বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, তবু এবারেও দরজা বন্ধ করে দিল দীপা।

বিছানায় এসে বসার পর সে বুঝতে পারলো যে তার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে।

চাঁদুর চাহনি দেখে হঠাৎ তার বুক কেঁপে উঠেছিল। কী হলো ছেলেটার, মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ? দরজায় ধাক্কা দেবার তার একটাই কারণ মনে হলো, সে যেন শুধু দীপাকে দেখতে চেয়েছিল।

এই বয়েসের ছেলেদের জীবনে অনেক রকম সংকট থাকে। আজ রাতে মনীশকে বলতে হবে। মনীশের যদি মাথা ঠাণ্ডা থাকে, তাহলে সে ঠিকই বুঝবে। প্রচুর সাহিত্য পাঠ করেছে সে, সাহিত্যের মধ্য দিয়েই সে মানুষের চরিত্র

চেনে।

ঘুম আর এলো না। পত্রিকাতেও মন বসলো না, দীপা এমনিই শুয়ে রইলো চোখ বুঁজে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে দরজায় আবার দুম দুম শব্দ হলো।

এবারে ভয়ে বুক কেঁপে উঠলো দীপার। চাঁদু একেবারে খেপে গেল নাকি ? খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়েও দীপা ভাবলো, দরজা সে খুলবে, না খুলবে না ? একটু আগেই তার গর্ভের সন্তান একবার মোচড় দিয়েছে।

দরজার ধাক্কাটা এবারে বেশ দৃঢ়। না খুললে পাড়াপ্রতিবেশী কৌতূহলী হবে। মনটাকে শক্ত করে দীপা এগিয়ে এলো। দরজাটা এক ঝটকায় খুলে ঠাণ্ডা-কঠিন গলায় সে বললো, কী হচ্ছে কী, চাঁদু ?

চাঁদু কুণ্ঠিতভাবে বললো, তোমার ঘুম ভাঙাতে হলো, বৌদি, তোমাকে একজন ডাকছে।

দীপা চোখ তুলে দেখলো সিঁড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধা।

প্রথমে দীপা ঠিক বিশ্বাস করতে পারলো না। যমুনার মা ?

সেই বৃদ্ধা ফোকলা দাঁতে হেসে বললো, কি গো দিদি, আমাকে চিনতে পারো না বুঝি ? আমার চোখে না হয় ছানি পড়েছে···

দীপা এগিয়ে এসে বৃদ্ধার হাত ধরে বললো, চিনতে পারবো না কেন ? তবে ভাবছিলুম, ভুল দেখছি কি না। মাসি, তুমি হঠাৎ এখানে ?

—আমার মেয়ে-জামাইয়ের বাড়ি যে এই যাদবপুরে। সেখেনে এসছিলুম, তাই ভাবলুম তোমাকে একবার দেখে যাই!

যমুনার মা দীপার বাপের বাড়ির অতি পুরোনো দাসী। ঠিক দাসীও নয়, হাউস কীপার বলা যায়। দীপার জন্মের আগে থেকে সে আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষের সময় সে দীপাদের বাড়ির দরজার কাছে একটা বাচ্চা মেয়ে কোলে নিয়ে মরতে বসেছিল, দীপার জ্যাঠামশাই মা ও মেয়েকে বাড়ি ভেতরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করে তাদের বাঁচান। সেই থেকে যমুনার মা রয়ে গেছে দীপাদের বাড়িতে। তার মেয়ে যমুনার বিয়েও দেওয়া হয়েছে ঐ বাড়ি থেকে।

ঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে দিয়ে দীপা বললো, বসো, মাসি। তোমার চেহারা তো একই রকম আছে দেখছি!

হাঁটুতে বাতের কষ্ট আছে বলে যমুনার মা বসলো আস্তে আস্তে। তারপর বললো, তুমি কিন্তু বাছা বেশ রোগা হয়ে গেছ!

দীপা হাসলো। না, এখন তাকে কেউ রোগা বলবে না, বরং সে পৃথুলতার দিকে এগোচ্ছে। স্নেহের আতশ কাচ সব কিছুই কমিয়ে দেখে।

—এ বাড়ির ঠিকানা কোথা থেকে পেলে বলো দেখি ?

—তোমার কোনো খবরই কি আমাদের জানতে বাকি আছে ? তুমি পোয়াতি হয়েছো, সে খবরও রাখি।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চাঁদু সব শুনছে। দীপা এগিয়ে গিয়ে তাকে বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলে, আমার কাছে খুচরো টাকা নেই, তোমার কাছে দু'তিন টাকা আছে ? চাঁদু মাথা নাড়তে দীপা বললো, একটু মিষ্টি কিনে নিয়ে এসো তো। আমার বাপের বাড়ির লোক এসেছে!

ফিরে এসে সে জিজ্ঞেস করলো, তা তোমরা কেমন আছো বলো ? যমুনার তো দুটি ছেলেমেয়ে, তাই না ?

—তারা সব ভালো আছে, তুমি কেমন আছো তাই বলো।

আজকাল কীসব কথা শুনি গো দিদি, ভয়ে বুক কাঁপে। ভদ্দরলোকদের বাড়িতে নতুন বউদের নাকি সব পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারছে!

মাসির চোখ মুখের নিদারুণ উৎকণ্ঠার অভিব্যক্তি দেখে দীপা হেসে ফেললো। ছেলেবেলায় এই মাসিকে নিয়ে তারা ভাইবোনেরা কত মজাই করেছে!

দীপা বললো, মাসি, সে তো বাপ-মা যে সব মেয়ের পণ আর যৌতুক দিয়ে বিয়ে দেয়, সেইসব মেয়েরাই পুড়ে মরে। আমার কী সেইরকম বিয়ে হয়েছে ?

—তা বাপু কিছুই বলা যায় না। কতলোক ভুলিয়ে ভালিয়ে মেয়েদের নিয়ে যায়। জামাই কোথায় ? তাকে দেখছি না!

—তাকে এই দুপুরবেলা পাবে কোথায় ? সে তো কাজে গেছে।

—তোমার এখানে ক'খানা ঘর ?··· ফিরিজ কিনেছো ? এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও না মা!

এতদিন পর যমুনার মা-কে দেখে দীপার মনটা বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এই বৃদ্ধাকে ঘিরে রয়েছে অনেক বাল্যস্মৃতি। তার ইচ্ছে করছে ওর সঙ্গে অনেক গল্প করতে।

কিন্তু তার মনে একটা সন্দেহও জেগেছে। তার বাড়ির লোক এ ঠিকানা নিশ্চয়ই রজতের কাছ থেকে পেয়েছে। যমুনার মা নিজে থেকে এসেছে তার খবর নিতে, না কি সে কারুর দূত ? সেটা না জানলে গল্প জমবে না।

—আচ্ছা মাসি, তুমি নিজে আমার ঠিকানা খুঁজে খুঁজে এতদূরে এসেছো ? এ

আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

—একলা কি আমি চলাফেরা করতে পারি ? পরেশ এসেছে আমার সঙ্গে, সে নিচে দাঁড়িয়ে আছে।

—পরেশ কে ?

—ও, তুমি তো তাকে দেখোনি। সে নতুন কাজে ঢুকেছে ও বাড়িতে।

আঁচলের খুঁট খুলে সে একটা চিঠি বার করে বললো, এই নাও, বৌদি দিয়েছে তোমাকে।

দীপার সমস্ত শরীরটা কঠিন হয়ে গেল। মায়ের চিঠি ! এই আড়াই বছরে কেউ একবারও তার খোঁজ নেয়নি। তার দাদা অমিতাভর সঙ্গে একবার মনীশের দেখা হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ, অমিতাভ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ব্রাহ্মণত্বের অহংকার। সে কথা মনে পড়লেই এখনো রাগে দীপার গা জ্বলে যায়। সে ব্রাহ্মণত্বের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না।

নীরস গলায় সে বললো, থাক, ও চিঠি আমার দরকার নেই। তোমার খবর বলো।

দুই ভুরু কপালে তুলে মহা বিস্ময়ের সঙ্গে বৃদ্ধা বললো, ও মা, সে কি গো ? নিজের মা চিঠি লিখেছে— ছি, ছি, ছি, এমন কথা বলে কখনো ? এই বুঝি লেখাপড়া শেখার গুণ !

চিঠিখানা সে জোর করে গুঁজে দিল দীপার হাতে। দীপা সেটা রেখে দিল খাটের ওপর।

—পড়লে না ?

—পরে পড়বো।

—না, এখুনি পড়ো। বৌদি আমায় বলে দিয়েছেন উত্তর নিয়ে যেতে। আর যদি উত্তর দিতে না চাও তাহলে তুমি আমার সঙ্গে একবারটি চলো।

এত মনের জোর দীপার, তবু চিঠিটা খুলতে তার হাত কাঁপছে। মায়ের ওপর তার প্রচণ্ড অভিমান। সে খুব আশা করেছিল, মনীশকে বিয়ে করবার ব্যাপারে বাড়ির অন্য কারুর না হোক মায়ের সমর্থন ঠিকই পাবে। কিন্তু মা-ই সবচেয়ে বেশি বেঁকে বসেছিলেন। মা বলেছিলেন, দাস ? তুই একটা শুদ্দুরের ছেলেকে বিয়ে করবি ? তোর রুচি বলেও কিছু নেই ? এই তোকে এত লেখাপড়া, গানবাজনা শেখালুম !

মা এমনভাবে দাস কথাটা উচ্চারণ করেছিলেন যেন ওটা কোনো বিষাক্ত পোকা মাকড়ের নাম ! মা রজতের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে রাজি ছিলেন। রজতরা

ভট্টাচার্য, মুখার্জিদের সঙ্গে ঠিক মেলে না, তবু ঐটুকু নামতে সম্মত হয়েছিলেন দয়া করে। মায়ের ঐ কথাটা শুনেই দীপার চূড়ান্ত জেদ চেপে যায়।

চিঠিখানি খুললো দীপা। মায়ের হাতের লেখা নয়। মায়ের জবানীতে হলেও খুব সম্ভবত বৌদি লিখে দিয়েছে।

দীপা,

কতদিন হয়ে গেল, তোমাকে দেখি না। তুমিও আমার খোঁজ নাও না। তুমি আমায় ভুলে থাকতে পারো, কিন্তু সন্তানের জন্য মায়ের মন সর্বদা উচাটন করে। এখনও তোমার চিন্তায় আমার ঘুম হয় না। তুমি সন্তানসম্ভবা হয়েছো শুনেছি,এই সময় তোমাকে একবার দেখতে খুব ইচ্ছা করে। আমার শরীর খুবই অসুস্থ, আর কতদিন বাঁচবো জানি না। তুমি যদি পারো তো আজই যমুনার মায়ের সঙ্গে চলে এসো। বেশি দেরি করলে হয়তো আর দেখা হবে না। তোমার ঠাকুরমার দু'খানি বালা তোমার নামে রাখা ছিল। তুমি সেদুটিও নিয়ে যাও নাই। তুমি এলে সেদুটি তোমার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি। আজই এলে ভাল হয়। কখন কী ঘটে তার তো ঠিক নাই।

ইতি

আং মা

চিঠিখানা অত্যন্ত ফর্মাল ধরনের। আজই যাবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে এবং গয়নার লোভ দেখানো হয়েছে। হয়তো এ চিঠির ভাষাও মায়ের নয়। বৌদির ?

অমিতাভর স্ত্রী বাসন্তীর সঙ্গে দীপার বেশ ভাব ছিল। বৌদি নিপাট ভালোমানুষ, ব্যক্তিত্ব একটু কম, সব সময় দাদার কথায় চলে। ছোটবেলা থেকেই দাদার প্রতি মায়ের একেবারে অন্ধ স্নেহ। বাবা ভালোবাসতেন দীপাকে। বাবা নেই, তিনি থাকলে হয়তো সব ব্যাপারটাই অন্য রকম হতো !

এতদিন বাদে গয়নার লোভ দেখিয়ে ডাকা হচ্ছে তাকে। মনীশের নাম উল্লেখ পর্যন্ত নেই। দীপার ইচ্ছে হলো তখুনি চিঠিখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে।

কিন্তু যমুনার মায়ের সামনে এরকম নাটকীয় কিছু করা ঠিক হবে না। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, মায়ের কী হয়েছে ? অসুখের কথা লিখেছেন।

যমুনার মা মুখখানা করুণ করে বললো, হ্যাঁ গো, বড্ড ভুগছেন। আমার যা রোগ, বৌদিরও সেই রোগ ধরেছে। বাতের ব্যথা বড় ব্যথা। প্রায়ই তো

বৌদিকে শয্যা নিতে হয়। আমি তবু কাজেকর্মে ভুলে থাকি!

বাতের অসুখের কথা শুনে দীপা বিশেষ গুরুত্ব দিল না। ঐ রোগটা কষ্টকর হলেও ঐ রুগীরা অনেকদিন বাঁচে। এখন-তখন অবস্থা হয় না।

—আর কী হয়েছে?

—বুক ধড়ফড় করে। বৌদির এমন বুক ধড়ফড় করে যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না!

মায়ের এই উপসর্গ আগেও ছিল, দীপা অনেকদিন ধরেই দেখছে। হঠাৎ নতুন করে গুরুত্ব পেতে পারে না।

—আর?

—খুব কাসি হয়! ইয়ে—মাথার ব্যথা হয়, মাথা ঘোরে।

যমুনার মা বানাচ্ছে, কিন্তু ঠিক পেরে উঠছে না। দীপা আর জেরা করলো না।

চাঁদু মিষ্টি নিয়ে এসেছে, দীপা প্লেটে সাজিয়ে এনে দিল।

দীপা কোনো আচার-অনুষ্ঠান মানে না, তবু একবার তার মনে হলো যে, তার মা মেয়ের বাড়িতে দূতী পাঠিয়েছেন, সঙ্গে এক বাক্স মিষ্টিও পাঠান নি?

খেতে খেতে যমুনার মা নানারকম গল্প করে যেতে লাগলো। ভুলি নামে কুকুরটা মরে গেছে। ছাদে একটা নতুন ঘর উঠেছে। পর পর দু'বার চুরি হয়ে গেল জলের পাম্প। দাদার ছেলে টুকুনের পৈতে হয়ে গেল গত মাসে। বাড়ির পেছন দিকে যে জমিটা পড়ে আছে শুধু শুধু, সেটা এবার বিক্রি হবে কথা চলছে।

শেষের কথাটা শুনে দীপার চোখ সরু হয়ে গেল।

—কী বললে, জমিটা বিক্রি হবে?

—হ্যাঁ গো। কথা প্রায় পাকা। তবে তোমারও সই লাগবে শুনছিলাম যেন!

সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে দীপা কাগজ ও কলম নিয়ে চিঠির উত্তর লিখতে বসলো। রাগে তার মুখখানা লালচে হয়ে গেছে।

ও, এই ব্যাপার! জমি বিক্রি করতে হবে বলে দীপার জন্য দরদ উথলে উঠেছে! স্নেহ-মমতা সব ধুলো হয়ে যায় বিষয়-সম্পত্তি টাকা-পয়সার জন্য! দীপাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে দলিলে সই করাবার উদ্যোগ! দীপা লিখলো:

মা,

তোমার চিঠি পেলাম। তুমি আমার স্বামীকে মেনে নাওনি। তুমি তাকে তোমাদের বাড়িতে যেতে বলোনি। আমার স্বামীর সন্তান এখন আমার গর্ভে,

সুতরাং তাকে নিয়েই বা আমি এখন কী করে যাই! আমার সন্তানও তো তোমাদের কাছে অবাঞ্ছিত।

ঠাকুমার বালা তুমি টুকুনের বিয়ের সময় ওর বৌকে দিও। আমার দরকার নেই। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে কোনো দলিলে যদি আমার সই-এর প্রয়োজন হয়, তাহলে সেই সব কাগজপত্র পাঠিয়ে দিও, আমি সঙ্গে সঙ্গে সই করে দেবো। তোমাদের এবিষয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না!

এই পর্যন্ত এক টানে লিখে গিয়ে দীপা একটু থামলো। শেষ বাক্যটা কি লেখা ঠিক হলো? মনীশকে একবার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল না? নাঃ, তার দরকার নেই। বিষয়-সম্পত্তি টাকা পয়সার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র লোভ নেই মনীশের, দীপাদের বাড়ির কথা সে কোনোদিন জিজ্ঞেস করে না।

দীপা এর পর লিখলো, তোমার শরীর তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুক, এই কামনা করি।

ইতি
দীপা।

মা দীপাকে খুকু বলে ডাকেন, ইচ্ছে করেই দীপা ডাকনামটা লিখলে না। চিঠিটা লিখে বেশ তৃপ্তি বোধ করলো সে। দাসদের বাড়ির বউ হয়ে সে লোভী ব্রাহ্মণদের একটা শিক্ষা দিয়ে যেতে চায়!

চিঠিখানা মাসির হাতে তুলে দিতে দিতে সে মনীশের প্রতি আরও বেশি ভালোবাসা বোধ করলো।

॥ ৭ ॥

কী জন্য যেন ট্রাম বন্ধ, বাসে সাংঘাতিক ভিড়, কলেজস্ট্রিট থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত হেঁটেই এলো মনীশ।

সুরঞ্জনের বই-এর দোকানে আড্ডা খুব জমে উঠেছিল। খাওয়া-দাওয়াও হলো খুব। রজতের আর একটি বই বেরিয়েছে, সেই উপলক্ষ্যে সে খাওয়ালো। প্রচুর কচুরি-তরকারি আর দানাদার। তিন রাউণ্ড চা।

সবাই মনীশকে বলেছিল, আজ আর টিউশানি যেতে হবে না, একদিন কাট মারো! কিন্তু মনীশ টিউশনিতে ফাঁকি মারতে অভ্যস্ত নয়। খুব ঝড়-বৃষ্টি বা অন্য কোনো গুরুতর কারণে একদিন না যেতে পারলে তার বুকের মধ্যে খচখচ করে। নিউ আলিপুরের ছাত্রটির তিনজন মাস্টার, দিন বদল করারও উপায় নেই।

প্রায় দিনই বিকেলে শুধু চা ছাড়া আর কিছুই খাওয়া হয় না, একলা একলা দোকানে ঢুকে খেতে তার লজ্জা করে। আজ আবার বড্ড বেশি খাওয়া হয়ে গেছে।

খুব বৃষ্টি পড়ছে, এরকম বৃষ্টি ভালো লাগে। লণ্ডনে এরকম বৃষ্টি হয়। এম এ পড়ার সময় মনীশদের হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট পি দাশগুপ্ত প্রায়ই তাঁর অক্সফোর্ড-জীবনের গল্প শোনাতেন। মনীশ স্বপ্ন দেখতো, সেও অক্সফোর্ডে পড়তে যাবে। যদিও সে মনে মনে জানতো যে কোনোদিনই তার সাধ্যে কুলোবে না, তাও স্বপ্ন দেখতে ক্ষতি কী?

এসপ্লানেডে আজ এত অসম্ভব ভিড় কেন? গাড়ি-ঘোড়ার কিছু বিপর্যয় হয়েছে। কিন্তু ট্রাম চলছে এদিকে। একটু দেরি হয় হোক, তবু মনীশ বাদুড়-ঝোলা ট্রামে উঠতে পারবে না। সে ট্রাম গুমটিতে দাঁড়ালো।

আজ কলেজস্ট্রিটের আড্ডায় ইংরেজ-কবিদের প্রসঙ্গ উঠেছিল। মনীশ তখন রোমান্টিক কবিদের কবিতার সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের কত অমিল থাকে, তা বোঝাতে গিয়ে লর্ড বায়রনের জীবনের কতকগুলো উদাহরণ দিয়েছিল। লর্ড বায়রন জন্তু-জানোয়ারদের খুব ভালোবাসতেন কিন্তু শিশুদের দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। বাচ্চাদের দেখলেও ঘেন্নায় গুলিয়ে উঠতো তার শরীর। সেইজন্যই বায়রন হেরডকে অসাধারণ শ্রদ্ধা করতেন। (বাইবেলের হেরড রাজা কংসের মতন কয়েক সহস্র শিশু-মৃত্যুর জন্য দায়ী।) প্রেমিক বায়রনের জন্য বেশ কয়েকটি মেয়েরও মৃত্যু ঘটেছে। শেলী এইজন্য একবার মারতে গিয়েছিলেন বায়রনকে।

এইসব শুনতে শুনতে রজত বলেছিল, শেলী, বায়রন, মেরি, ক্লেয়ার—এঁদের সম্পর্ক নিয়ে আপনি একটা বই লিখুন না!

লেখার কথা উঠলেই মনীশ লজ্জা পায়। ছাত্র-বয়েসে সে দু'চারটে গল্প-কবিতা লেখার চেষ্টা করেছিল, কোনোটাই সুবিধে হয়নি। নিজের অযোগ্যতা সে যথাসময়ে বুঝে গিয়ে নিরস্ত হয়েছে।

সে বলেছিল, এই নিয়ে অনেক বই আছে। ট্রেলানি লিখেছে, আঁদ্রে মরোয়া-র 'এরিয়েল' তো খুব বিখ্যাত!

রজত বলেছিল, কিন্তু বাংলায় তো বিশেষ কিছু নেই। আপনি বাংলাতে লিখুন!

—আমার লেখা আসে না।

—আপনি তাহলে ভালো কোনো বইয়ের অনুবাদ করুন, আমি পাবলিশার

জোগাড় করে দেবো!

মনীশের এটাই আশ্চর্য লাগে যে, রজত তাকে আগ বাড়িয়ে সাহায্য করতে চায় কেন?

রজত মাঝে মাঝে অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করে, দীপা কেমন আছে?

রজতের কি রাগ, ঈর্ষা, দুঃখ এসব কিছুই নেই? কী চায় সে জীবনে?

একটা ট্রাম একটু ফাঁকা দেখে মনীশ উঠে পড়লো। বসবার জায়গা পাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিছু কিছু মানুষের ট্রাম-বাসের সিটের ওপর মনোপলি আছে। মনীশের শরীরে ক্লান্ত-ক্লান্ত ভাব, মানুষের ঠেলাঠেলি ভালো লাগছে না। আজ একটু বেশি খরচ করে মিনিবাসে উঠলেই হতো!

এই সময়ে একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে যেতে পারলে কিছুটা নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সমুদ্র না পাহাড়? মনীশ আজ পাহাড় বেছে নিল। দু'বার সে দেওঘর আর মধুপুর গেছে, সেইটুকুই যা পাহাড় দেখা। এত কাছে দার্জিলিং, তাও সেখানে যাওয়া হয়নি। তবু কল্পনা করতে তো কোনো অসুবিধে নেই। একবার দীপাকে নিয়ে দার্জিলিং যেতে হবে, জলাপাহাড়ে সে আর দীপা পাশাপাশি হাঁটছে, দীপার গায়ে একটা টুকটুকে লাল রঙের শাল, সে নিজে প্যান্ট, শার্ট আর সোয়েটার পরে আছে, এবারে প্যান্ট কিনতে হবে।

হঠাৎ মনীশের চোখের সামনে সব ছবি মুছে গিয়ে অন্ধকার হয়ে এলো।

মনীশ আঁতকে উঠে ভাবলো, আবার? এই রে! কচুরি খাওয়ার জন্য গ্যাস হয়েছে। অতগুলো কচুরি খাওয়া ঠিক হয়নি। আজ তো ব্যাটা বড্ড ব্যথা দিচ্ছে! হাতে জোর নেই, হ্যাণ্ডেল ধরে রাখা যাচ্ছে না··· নাঃ, স্পেশালিস্ট দেখাতেই হবে এবার। বেশি দেরি হয়ে যায়নি তো? কী যেন নাম ছিল ডাক্তারটার··· কাগজটা ফেলে দিয়েছে··· মনে পড়ে যাবে, আর দেরি নয়··· কালই··· আচ্ছা, রজতের সঙ্গে দীপার বিয়ে হলে কেমন হতো? দীপা সুখী হতে পারতো··· দীপা, দীপা, আমাকে ধরো, আমি আর পারছি না···

মনীশ প্রথমে অন্য একজনের পিঠে, তারপর সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। কাছাকাছি লোকেরা ভাবলো, তার হাত থেকে বোধহয় পয়সা পড়ে গেছে, তাই সে বসে পড়ে খুঁজছে। কিন্তু মনীশ শুয়ে পড়েছে অন্যান্য যাত্রীদের পায়ের কাছে।

একজন চেঁচিয়ে বললো, আরে, ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে যে!

ট্রাম তখন ময়দানের অন্ধকার দিয়ে ছুটছে।

কুশ প্রায় রাত সাড়ে ন'টায় বাড়ি ফিরেই চেঁচিয়ে বললো, চেঁদো ! চেঁদোটা কোথায় গেল ? আজ দেখাচ্ছি মজা !

দীপা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো তাড়াতাড়ি। কুশ চাঁদুর চেয়ে মাত্র দু'বছরের বড় বলে সব সময় দাদাগিরি ফলায়, চাঁদুর মাথায় গাঁট্টা মারে। মাঝে মাঝে রেগে ওঠে চাঁদু।

দীপা জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে ?

কুশ বললো, আজ ওদের কলেজের সোস্যাল ফাংশান দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে সব শুনলুম !

—কী শুনলে !

—ব্যাটা কলেজ যাওয়া বন্ধ করেছে ! বাড়ি থেকে কলেজের নাম করে বেরোয়, সারা দুপুর অন্য কোথাও বসে থাকে। ওদের ইউনিয়ানের ভাইস প্রেসিডেন্ট আমাকে বললো, চাঁদু দশ-বারোদিন কলেজে যায় না ! কেন জানো ? একটা মেয়ে ওকে ইনসাল্ট করেছে !

চাঁদু নিজের ঘরে বসে সব শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু বেরিয়ে এলো না। দীপা কৌতূহলী হয়ে উঠলো। মেয়ে ? চাঁদুদের কলেজে তো কোনো মেয়ে পড়ে না !

কুশ মাথার ওপর উল্টে জামাটা খুলে ফেললো। তাতে পকেট থেকে খসে পড়লো তার সিগারেটের প্যাকেট। আজকাল অবশ্য বাড়িতে সে প্রকাশ্যেই সিগারেট খায়, সুতরাং লজ্জার কিছু নেই।

একটা সিগারেট ধরিয়ে কুশ বললো, ওদের ভাইস প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে আমি সব শুনেছি। সে আমাকেও চার্জ করে বললো, তোমার ভাইটা একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন, গোঁয়ার !

—কী হয়েছে, খুলে বলো না !

—ওদের সোস্যাল ফাংশানে ছাত্র-ছাত্রীরা একটা গীতি-নাট্য করলো

—ছাত্রী আবার এলো কোথা থেকে ?

—ওদের মর্নিং সেকশানের মেয়েরা আছে না ? কম্বাইণ্ড সোস্যাল হয়। গীতি-নাট্যটা একসঙ্গে করে। তাতে চাঁদুর কোরাস গান ছিল আর আবৃত্তি ছিল !

—গান ? ও গান করে নাকি ?

—তাই তো শুনলুম। বাড়িতে কোনোদিন মুখ খোলে না, কিন্তু পেটে পেটে অনেক কিছু আছে।

—চাঁদু শেষ পর্যন্ত করলো না কেন ?

—ঐ যে, একটা মেয়ে নাকি ইনসাল্ট করেছে ? দু'জন মেয়ে আর দু'জন ছেলের কোরাস, তার মধ্যে একটা মেয়ে একদিন বলেছে, সে চাঁদুর পাশে বসে গান গাইতে পারবে না। ওর গায়ে বড্ড গন্ধ !

দীপা হাসি সামলাতে পারলো না, সে আঁচলে মুখ চাপা দিল।

ওদের কলেজের মেয়েটি তো মিথ্যে কিছু বলেনি। চাঁদুর দুটি মাত্র জামা, দীপা কতবার বলেছে, প্রত্যেকদিন রাত্তিরে একটা জামা কেচে দিতে। চাঁদু তা শোনে না। চার পাঁচদিন একই জামা পড়ে কলেজে যায়। এই গুমোট গরমের সময় এক বেলাতেই জামা ভিজে যায় ঘামে আর··· ! মেয়েটি নিশ্চয়ই বালিগঞ্জের, ওদের নাকে বেশি গন্ধ লাগে, ওখানকার রাস্তায় নোংরা জমে না তো !

কুশ বললো, একটা মেয়ে ইনসাল্ট করেছে, তার মুখের ওপর জবাব দিবি তো ! তা না, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে !

দীপা এখনো হাসছে, কী ফাজিল এখনকার মেয়েগুলো, মুখের ওপর বলে দিল, গায়ে গন্ধ, পাশে বসবো না ! বাথরুমে দীপার পাউডারটা এবার তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল। চাঁদু নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে তার পাউডার মাখতে শুরু করেছে।

—ওদের ভাইস প্রেসিডেন্ট বললো, গানটা না হয় চাঁদু বাদ দিল, তাতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু ওর একটা সোলো আবৃত্তি ছিল, লাস্ট মোমেন্টে সেটার জন্য অন্য ছেলে ঠিক করতে হলো। সে ভালো মুখস্থ করতে পারেনি !

ঘর থেকে চাঁদু বলে উঠলো, আমি তো জানিয়ে দিয়েছিলুম, আমি কোনোটাই করবো না।

দীপা আর কুশ চলে এলো এ ঘরে।

চাঁদু খাটে শুয়ে একটা খোলা খাতায় কী সব লিখছিল, ওদের দেখে খাতাটা বন্ধ করে দিল তাড়াতাড়ি।

চাঁদু প্রায়ই কিছু লিখতে লিখতে কারুকে দেখলে খাতা বন্ধ করে দেয়। দীপা এটা লক্ষ্য করেছে। আজ তার মনে হলো, চাঁদু যখন গান গায়, আবৃত্তি করে, তাহলে সে নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতাও লেখে।

দীপা কাছে এসে টপ করে তুলে নিল চাঁদুর খাতাটা।

হ্যাঁ, কবিতাই বটে। কবিতার মতন, খুবই কাঁচা। দু'চার লাইন পড়েই দীপা বুঝলো, সেটি কোনো মেয়েকে উদ্দেশ করে অভিমানের স্তোত্র।

কুশকে সে জিজ্ঞেস করলো, মেয়েটার নাম কী ঝর্ণা ?

—না, বর্ণা ভাদুড়ী।

—তাকেই ঝর্ণা বানিয়েছে। এই দ্যাখো, তাকে নিয়ে কবিতা লিখেছে !

কুশ খাতাটা নিতেই চাঁদু লাফিয়ে উঠে এসে এমনভাবে খাতাটা কেড়ে নিল যেন কোনো রাজা তার হৃত রাজমুকুট উদ্ধার করছে। দীপার দিকেও সে এমন ভাবে তাকালো যেন সেই ভাগ্যহীন রাজা এইমাত্র জানতে পেরেছে যে তাঁর প্রিয়তমা মহিষীই বিশ্বাসঘাতিনী !

কুশ বিপক্ষের সেনাপতি, সেও ছাড়বে না। লেগে গেল ঝটাপটি। প্রথমে খাটের ওপর, তারপর মেঝেতে দু'জনের গড়াগড়ি। খাতাটা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম।

দীপা বুঝতে পারলো যে চাঁদুকে এরকম অবস্থায় ফেলাটা তার ভুল হয়েছে। যারা কবিতা লেখে, তারা সে-ব্যাপারে বড্ড স্পর্শকাতর হয়। কলেজের ছেলেমেয়েদের কথা শুনে দীপাও যেন হঠাৎ তার কলেজ জীবনে ফিরে গিয়েছিল, সেইজন্যেই এই লঘু চাপল্য।

সে বললো, এই ছাড়ো ছাড়ো ! কুশ, খাতাটা আমাকে দাও ! দাও, বলছি !

তাও ওরা কেউ শোনে না। তখন দীপাও ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'জনের গালে চড় মারতে মারতে অতি কষ্টে উদ্ধার করলো খাতাটা।

চাঁদু তীব্র অভিমানের সঙ্গে বললো, বৌদি, তুমি···তুমি এটা করলে ? কুশ এখন আমাদের কলেজের সবাইকে বলে দেবে !

দীপা বললো, না, কুশ, আমাদের ঘরের কথা বাইরে কারুকে বললে চলবে না !

কুশ হি হি করে হাসছে।

দীপা ধমক দিয়ে বললো, কুশ, আমি কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, যদি তুমি এই কবিতার কথা অন্য কারুকে বলো, তাহলে আমি কেলেংকারি করবো। সাতদিন খেতে দেবো না। এমনকি তোমার দাদাকেও বলবে না। ওটা আমাদের তিনজনের ব্যাপার।

কুশ বললো, বৌদি, তুমি তাহলে কবিতাটা পড়ে শোনাও !

—এখন নয়। খাতাটা আমার কাছে থাকবে। আগে আমি সবটা পড়ে নিই।

চাঁদু বললো, বৌদি, তোমার পায়ে ধরছি ! খাতাটা দাও !

দীপা বললো, আমার কাছে লজ্জা কী ? কবিতা তো শুধু যে লেখে তার সম্পত্তি নয়, অন্যদের পড়াতে হয় ! ঠিক আছে, কবিতার কথা এখন থাক। চাঁদু তুমি কী গান গাইছিলে কলেজে ? সেটা আমাদের শোনাও !

চাঁদু আরও লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে বললো, সে কিছু না বৌদি, ওরাই জোর করে আমাকে কোরাসে গাইতে বলেছিল।

—সেইটাই শোনাও আমাদের !

কুশ বললো, দশটা বেজে গেল, দাদা এখনো এলো না ?

মনীশ সাধারণত প্রয়োজনের বেশি দেরি করে না। বাইরের আড্ডার চেয়ে সে বাড়ির পরিবেশ ভালোবাসে। বিছানার ওপর রয়ে গেছে একটা ওল্টানো বই। সে সকালে আধখানা পড়ে গেছে, বাকিটা বাড়ি ফিরে পড়বে।

কুশ বললো, আমার খুব খিদে পেয়েছে কিন্তু দাদা না ফিরলে তো খাওয়া হবে না। আজ অনেকগুলো রুটে বাস বন্ধ হয়ে গেছে।

দীপা বললো, তোমরা দু'জনে খেয়ে নিতে পারো।

কুশ বললো, না থাক। বৌদি, এখন এককাপ চা খেলে কী রকম হয় ? প্লীজ, খাওয়াবে ?

চা নিয়ে বসবার পর চাঁদু দু'খানা গান শোনালো। পল্লীগীতি। গলায় সুর তেমন নেই। কিন্তু জোর আছে। দীপা অনেকদিন গান শিখেছে। এমন জোরালো পুরুষকণ্ঠ বিশেষ শুনতে পাওয়া যায় না। চাঁদুর একক গান তেমন সুবিধের না হলেও কোরাসে এইরকম কণ্ঠ খুব প্রয়োজনীয়।

দীপা জিজ্ঞেস করলো, চাঁদু, তুমি কোনোদিন সা রে গা মা শিখেছো ?

চাঁদু হেসে বললো, ওসব আমি কিছু জানি না। গ্রামে থাকতে শুনে শুনে গান শিখেছি !

দীপা বললো, দেখা যাক, পরে ধার-টার করে যদি একটা হারমোনিয়াম কেনা যায়, আমি তোমাকে শিখিয়ে দেবো। একটু গলা সাধলে তুমি ভালো গান গাইতে পারবে ! রেডিওটাতেও তো কতদিন ব্যাটারি ভরা হয়নি। রেডিও শুনেও শেখা যায় !

—বৌদি, তুমি বিয়ের আগে দাদাকে গান শোনাতে ?

—ধ্যাৎ ! আমাদের দেখা হতো রাস্তায় রাস্তায় ! তাও সব সময় ভয়, ওর কোন্ ছাত্র দেখে ফেলবে !

—তুমি তো গান জানো, আমাদের একটা শোনাও !

অনেকদিন পর দীপা একটা পুরো গান গাইলো। শরীরটা ঝিমঝিম করতে লাগলো তার। যেন পুরোনো একটা নেশার দ্রব্য বহুকাল পরে সে পান করেছে।

দ্বিতীয় গানটি সে বিনা অনুরোধেই গাইলো চোখ বুজে। কেন তার চোখে জল এসে যাচ্ছে ? নাঃ, গানের চর্চাটা ছেড়ে দেওয়াটা তার ভুলই হয়েছে।

এগারোটা বেজে গেল, তবু মনীশ এলো না।

এত রাত যে হয়েছে, সেটাও ওদের খেয়াল নেই। ট্রাম-বাসের গণ্ডগোলের

জন্যই মনীশের দেরি হচ্ছে। রাস্তায় সাইকেল রিক্সার আওয়াজ শোনা যায়, এখনো মানুষের যাতায়াত বন্ধ হয় নি।

পৌনে বারোটার সময় নিচের দরজা খটখট করে উঠলো। তিনজনে একসঙ্গে দৌড়ে গেল বারান্দায়।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের পোশাক পরা একজন লোক। অদূরে একটা পুলিশের গাড়ি।

ফ্যাকাসে হয়ে গেল কুশের মুখ। সে সঙ্গে সঙ্গে সরে এলো বারান্দা থেকে।

দীপা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আজ কিছু করেছো?

কুশ ভয়ে কাঁপছে। দীপার হাত চেপে ধরে সে বললো, না, বিশ্বাস করো, আমি কিছু করি নি। আমি আর ওদের সঙ্গে মিশি না!

কথা বলার সময় নেই, নিচের ভাড়াটেরা দরজা খুলে দিয়েছে, পুলিশের লোকটি সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে ওপরে।

কুশ দৌড়ে গিয়ে বাথরুমের মধ্যে লুকোলো।

অল্পবয়েসী পুলিশের একজন সাব-ইনসপেকটর দরজার কাছে এসে দীপা ও চাঁদুর মুখের দিকে তাকালো। দীপার দিকে কয়েক পলক দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তারপর সে চাঁদুকে জিজ্ঞেস করলো, এটা প্রফেসার মনীশ দাসের বাড়ি!

চাঁদুরও পুলিশের সঙ্গে কথা বলার অভ্যেস নেই। সে শুকনো ভাবে বললো, হ্যাঁ।

পুলিশটি চাঁদুকে বললো, আপনি আমার সঙ্গে একটু নিচে আসুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

দীপা সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ গলায় বললো, ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন— কী বলবেন, আমার সামনে বলুন!

পুলিশটি নম্র গলায় বললো, আপনি ভয় পাবেন না, আমি ওকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছি না। দু'একটা জরুরি কথা জিজ্ঞেস করবো!

—আমার সামনে তা জিজ্ঞেস করা যায় না?

—না, একটু অসুবিধে আছে। আপনি আসুন।

চাঁদুর কাঁধে হাত দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পুলিশটি জিজ্ঞেস করলো, মনীশ দাস আপনার কে হয়?

—দাদা।

—এখানে আর কে কে থাকে?

—বৌদি আছেন, আর আমি। এখন আর কেউ নেই!

রাস্তায় এসে পুলিশটি চাঁদুর মুখোমুখি দাঁড়ালো। সে একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেশলাই কাঠি খরচ করলো চার পাঁচটা। পুলিশটি নার্ভাস।

সে বললো, কী করে ব্যাপারটা বলবো—ঠিক বুঝতে পারছি না—আমি এ কাজ আগে করিনি—হেস্টিংস থানা থেকে আমাদের থানায় ফোন করেছিল—নামটা আমারও চেনা, তাই রাত্তিরেই ছুটে এলুম—

চাঁদু নির্বাকভাবে শুনছে। সে এখনো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। পুলিশ আসা মানেই ক্ষয়-ক্ষতির ব্যাপার। হয় টাকা চাইবে, অথবা কারুকে ধরে নিয়ে যাবে। গ্রামে সে এই রকমই দেখেছে।

পুলিশটি বললো, ট্রামের কয়েকজন প্যাসেঞ্জার হেস্টিংস থানায় একটা বডি জমা দেয়, বুঝলেন, থানা থেকে পাঠানো হলো হাসপাতালে, সেখানে অল রেডি ডেড বলে ডিক্লেয়ার করা হলো, বুঝলেন, পকেটে আইডেন্টিফিকেশনের কাগজপত্র কিছু ছিল না—আন-আইডেন্টিফায়েড বডি তো হাসপাতালে রাখা হয় না, তাই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে মোমিনপুর মর্গে। আপনাকে একবার সেখানে যেতে হবে। এখন আর গিয়ে লাভ নেই। কাল সকালে।

চাঁদু তবু কিছু বুঝতে পারছে না।

—আমায় কোথায় যেতে হবে বললেন?

—মর্গে। মোমিনপুরে।

—মর্গ কী? সেখানে আমি কেন যাবো?

—মনীশ দাস আপনার দাদা তো? হাসপাতালে নাকি একজন ক্রিটিকাল রুগীর কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন বাইরে অপেক্ষা করছিল, তাদের মধ্যে একজন লাশ দেখে বলেছে, সে চেনে, সে মনীশ দাসের ছাত্র ছিল। ইন ফ্যাক্ট, আমিও মনীশ দাসের কাছে বঙ্গবাসী কলেজে পড়েছি।

এবারে চাঁদু কেঁপে উঠলো। লাশ? আমার দাদা।

—শুনুন, ভুলও হতে পারে। একজন লোক শুধু ঐ নাম বলেছে, রাত্তিরবেলা তার ভুল হতে পারে না? আপনি মর্গে গিয়ে আইডেন্টিফাই করুন।

—আমার দাদা?

—আপনার বৌদির নাম কী?

—দীপা।

পুলিশটি দারুণ আফশোসের শব্দ করে বললো, এঃ হে! ছি ছি ছি! এত অল্প বয়েসে! ট্রামের একজন প্যাসেঞ্জার নাকি বলেছে যে উনি লাস্ট কথা বলেছিলেন, দীপা, দীপা, দীপাকে ডাকো, দীপাকে খবর দাও!

॥ ৮ ॥

মনীশ শুধু নিজে চলে গেল না, সে দীপার গর্ভের সন্তানকেও প্রায় নিতে বসেছিল।

প্রথম আট-দশদিন দীপাকে কিছুতেই সামলানো যাচ্ছিল না। সে উন্মাদিনী হয়ে গিয়েছিল।

দীপার বাপের বাড়ির লোকরা খবর পায় তিনদিন পর। সবাই এসেছিল। যাকে নিয়ে বিরোধ সে-ই তো আর নেই। দীপা তাদের একটাও সান্ত্বনা বাক্য শোনেনি, তাদের সঙ্গে একটাও কথা বলেনি, সর্বক্ষণ সে উপুড় হয়ে শুয়েছিল বিছানায়। দীপার মা তাকে জোর করে টেনে তোলার চেষ্টা করলে দীপা মায়ের হাত কামড়ে দিয়েছিল।

দীপার ইস্কুলের এক সহকর্মিণী অনীতা তিনদিন থেকে গেল এ বাড়িতে। সে মেয়েটিও বিবাহিতা, স্বামী-বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সংসার আছে, তবু সে দীপাকে সত্যিই ভালোবাসে। নিজের সংসার ছেড়ে সে দীপার পরিচর্যা করে গেল সারাক্ষণ। তার পরেও সে রাত্তিরটা বাদ দিয়ে অন্য সময় এসে থাকে।

চাঁদু আর কুশ যেন বোবা হয়ে গেছে!

দীপাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচালো প্রকৃতি। প্রকৃতির মায়া-দয়া নেই, যারা চলে যায় তাদের নিয়ে প্রকৃতি মাথা ঘামায় না। জীবনের প্রবহমানতা রক্ষা করাই প্রকৃতির একমাত্র কাজ। পাছে মনীশের শোকে দীপার যথেচ্ছাচারের ফলে পেটের সন্তানটি নষ্ট হয়ে যায়, তাই নির্দিষ্ট সময়ের দেড় মাস আগেই দীপার ব্যথা উঠলো। এই ব্যথা মেয়েদের অন্য সব জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়।

অনীতার স্বামী একজন জুনিয়র প্যাথোলজিস্ট। সেই ভদ্রলোকই ব্যবস্থা করে কাছাকাছি একটি শস্তার নার্সিংহোমে ভর্তি করে দিলেন দীপাকে।

মনীশের মৃত্যুর চোদ্দদিন পর জন্মালো তার পুত্র সন্তান।

বুকের কাছে সেই শিশুকে দেখেই দীপা আবার সুস্থ হয়ে উঠলো। বুকের মধ্যে প্রকৃতির দেওয়া স্নেহ এমনই মোচড় দেয় যে অন্য কথা আর বিশেষ মনে পড়ে না।

ভিজিটিং আওয়ারে দীপার বাপের বাড়ির লোকজন ভিড় করে থাকে, কুশ আর চাঁদু সামনে আসতে পারে না। এদের পোশাক পরিচ্ছদ দামী, হাসপাতালেও সেজেগুজে আসে, চকচকে চেহারা, অন্য রকম কথাবার্তা, এদের সঙ্গে কুশ আর চাঁদুর একটুও মেলে না।

দীপা চোখ তুলে তাকিয়ে ওদের খুঁজলে কুশ তবু ঠেলেঠুলে কাছে আসে, চাঁদু আসতে সাহস পায় না। চাঁদুকে দেখে যে-কেউ ভাবতে পারে, সে বুঝি বাড়ির চাকর। সে যে কলেজের ছাত্র, মোটামুটি গান গাইতে পারে, প্রেমের কবিতা লেখে, এসব তার চেহারা দেখে সত্যিই বোঝবার উপায় নেই।

দীপার মা বললেন, তোর আর এখান থেকে ও বাড়ি ফিরে দরকার নেই। তোর দাদা তোকে এখান থেকে সোজা বরানগরে নিয়ে যাবে।

দীপা বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে, কোমর থেকে পা পর্যন্ত একটা চাদরে ঢাকা। এমন শীর্ণ হয়ে গেছে মুখখানা যে চেনাই যায় না। রুক্ষ চুল, চোখের নিচে গভীর কালো দাগ।

সে আস্তে আস্তে বললো, না মা, ওখানেই ফিরে যেতে হবে।

মা বললেন, ওখানে ফিরে গিয়ে কী করবি? এই সময়ে কে দেখবে? বরানগরের বাড়িতে তোর নিজস্ব ঘর এতদিন তালাবন্ধ আছে, কেউ কোনো জিনিস ছোঁয়নি। যমুনার মা বাচ্চাটাকে দেখতে পারবে!

দীপা তবু বললো, না, মা, আমি ওখানেই ফিরে যাবো।

—কেন জেদ করছিস, খুকু? যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

মায়ের সঙ্গে তর্ক করতে চাইলো না দীপা। হয়তো মা ঠিকই বলছেন। তার সন্তানকে বাঁচাতে হলে বরানগরে ফিরে যেতেই হবে।

সে বললো, আচ্ছা যাবো। কয়েক দিন পর। ও বাড়িতে সব ছড়িয়ে আছে, আগে একটা ব্যবস্থা করে নিই।

—আলমারির চাবি কার কাছে?

—আলমারি তো নেই।

—সে যাক, সে সব হবে'খন। তুই আর ওসব নিয়ে চিন্তা করিস না।

মনীশের কলেজস্ট্রিটের বন্ধু সুরঞ্জন আর দু' তিনজন দেখতে এসেছিল একদিন। তাদের মধ্যে রজতও ছিল। সুরঞ্জন ছাড়া অন্য কেউ কোনো কথা বলে নি। সুরঞ্জন শুধু বলেছিল, মনীশ তার বইয়ের দোকানে অনেক অনুবাদের কাজ করে দিয়েছে, সেই জন্য মনীশের কিছু টাকা পাওনা আছে তার কাছে। দরকার হলে দীপা যেন চাইতে দ্বিধা না করে।

দীপা ঘাড় নেড়ে ছিল।

শনিবার বিকেলবেলা দীপাকে ছেড়ে দেবার কথা। শনিবার সকালে চাঁদু আর কুশ এসেছে, দীপার বাপের বাড়ির কেউ তখনও আসেনি। দীপা কুশকে বললো, দ্যাখো তো ডাক্তারবাবু আছেন কি না। উনি যদি রাজি থাকেন তা হলে আমি এ

বেলাই বাড়ি চলে যাবো।

ডাক্তারবাবু আপত্তি করলেন না। একবার এসে দীপাকে দেখে গেলেন। শিশু ও জননী দু জনেই ভালো আছে।

দীপা চাঁদুকে বললেন, তুমি চট করে বাড়ি চলে যাও। আমার বিছানার তোষকের নিচে একটা খাম আছে, সেটা নিয়ে এসো। আসবার সময় একেবারে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনবে।

কুশ অফিস ঘরে গেল কত চার্জ হয়েছে তার খবর আনতে। তার সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এলেন ডাক্তারবাবু। তিনি মনীশের সব কথা শুনেছেন। তাঁর নার্সিংহোমে এই প্রথম পসথুমাস বেবী জন্মালো।

তিনি দীপাকে বললেন, কয়েকদিন আগে সুরঞ্জন রায় নামে এক ভদ্রলোক এক হাজার টাকা জমা দিয়ে গেছেন আপনার নামে। সেটাই যথেষ্ট। আর একটা পয়সাও লাগবে না। নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি চলে যান, শরীরের যত্ন নিন। মনে রাখবেন, বেবীকে ভালো মতন বাঁচিয়ে রাখতে গেলে মায়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখা সবচেয়ে বেশি দরকার।

দীপার চোখের কোণে চিকচিক করছে জল। সুরঞ্জনের প্রতি সে বেশি কৃতজ্ঞতাবোধ করলো এই কারণে যে তার বাপের বাড়ির থেকে কিছু দেবার আগেই সুরঞ্জন টাকাটা দিয়ে দিয়েছে। ঐ একই উদ্দেশ্যেই তো দীপা বিকেলের বদলে সকালে চলে যেতে চাইছে।

নার্সিংহোম থেকে একজন আয়া সঙ্গে নিয়ে গেল দীপা।

বাড়ি ফিরে দীপা অনেকদিন বাদে ভালো ভাবে স্নান করলো। নিজের ঘরটা গোছালো। আলনায় ঝুলছে মনীশের জামা, খাটের তলায় মনীশের চটি। যেন মনীশের উপস্থিতির উত্তাপ এই ঘরে এখনো লেগে আছে।

কুশদের ঘরটায় উঁকি মেরে সে বললো, ইস, কী অবস্থা করেছো ঘরটার ? আমি ক'দিন মাত্র ছিলুম না—

একটা ঝাঁটা নিয়ে সে নিজেই ঝাঁট দেবার চেষ্টা করতেই তার মাথা ঘুরে গেল। সে পড়ে যাবার আগেই কুশ আর চাঁদু দু'দিক থেকে ধরে ফেললো তাকে।

কুশ বললো, ফিরেই তুমি এসব শুরু করেছো ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে !

দীপা ফিস ফিস করে বললো, হ্যাঁ, আমার ভুল হয়ে গেছে। আর কটা দিন লাগবে। তোমরা ঘরটা একটু গুছিয়ে রাখো। এখন অনেক বাইরের লোকজন

আসবে।

কুশ আর চাঁদু ধরে ধরে এনে শুইয়ে দিল দীপাকে।

বিকেলবেলা নার্সিংহোমে দীপাকে দেখতে না পেয়ে মা আর এক খুড়তুতো ভাই ক্ষুব্ধ হয়ে চলে এলেন এ বাড়িতে। মা বললেন, তুই এ কী করলি খুকু ? বরানগরের বাড়িতে তোর ঘর পরিষ্কার করিয়ে রেখেছি, আয়ার ব্যবস্থা করেছি।

দীপা ক্লিষ্ট স্বরে বললো, এই বিছানাটার জন্য বড্ড মন-কেমন করছিল মা। দুটো দিন এখানে থাকি, তারপরে যাবো।

—এই বিছানাটাই তা হলে নিয়ে চল।

—এই ঘরটা ?

—এবার তুই পাগলের মতন কথা বলছিস, খুকু ? এখানে থাকবি কী করে ? তোকে বাঁচতে হবে না ?

—আর দুটো দিন যাক, মা। তারপর যাবো। তোমাকে আর কষ্ট করে এতদূর আসতে হবে না। তুমি তপন কিংবা টোটোকে পাঠিয়ে দিও।

এই মাস শেষ হতে আর সাত দিন বাকি। মাসটা পুরো হলেই দীপা এখানকার সংসার তুলে দিয়ে বরানগরে ফিরে যাবে। এই আশ্বাস নিয়ে দীপার মা ফিরে গেলেন। যাবার সময় তিনি চাঁদু আর কুশের দিকে চাইলেন আড় চোখে। এ পর্যন্ত তিনি ওদের সঙ্গে একটা কথাও বলেননি।

তিন দিন বাদে আয়াটিকে ছাড়িয়ে দিল দীপা। স্ত্রীলোকটি বড় বক বক করে। তার মুখের ভাষা খারাপ। সে চাঁদুকে বলেছিল মুস্কো জোয়ান। চাঁদু বাচ্চাটিকে একবার তুলে নিয়ে আদর করতে যেতেই সে বলেছিল, ওরে বাবা, এত বড় একটা মুস্কো জোয়ানের হাতে এইটুকু বাচ্চাকে দিতে ভয় করে। তুমি আরি দু' চারদিন পরে নিও বাছা।

দীপা খারাপ ভাষা একেবারে সহ্য করতে পারে না। এই আয়াটি বেশি কথা বলে বলেই তার মধ্যে বেশি খারাপ কথা থাকে। নার্সিংহোমের আর একটি আয়ার প্রসঙ্গে সে বলেছিল, গতরখাকী। কথাটা শোনা মাত্র দীপার কানে চড়াং করে লেগেছিল। সেই মুহূর্তে সে ঠিক করেছিল, ওকে আর রাখবে না।

বাচ্চাকে তেল মাখানো, গা মোছানো সে শিখে নিয়েছে। আর আয়া রাখার দরকারও নেই। দীপা গায়ের জোরও অনেকটা ফিরে পেয়েছে। সন্ধের দিকে চাঁদু বাইরে গিয়েছিল একবার, কুশ বাথরুমে, দীপা তখন রান্না ঘরে ঢুকে দিব্যি দুধ গরম করে নিতে পারলো।

দুধটা তার নিজের জন্য। বাচ্চাকে সে বুকের দুধ খাওয়াবে। আগে দীপা দুধ

মুখে দিতে পারতো না, তার গন্ধ লাগতো। এখন এই ক'দিন সে দু' বেলা দুধ খাচ্ছে, স্বার্থপরের মতন। ডাক্তারের নির্দেশ সে মানবেই। শরীরের জোর না এলে মনের জোর আসে না।

ব্লাউজের বোতাম খুলে বাচ্চার মুখটা একটা স্তনে দেবার পর তার খেয়াল হলো দরজাটা বন্ধ করা হয়নি। চাঁদু কিংবা কুশ যদি হঠাৎ ঢুকে পড়ে?

এখন উঠতে গেলেই বাচ্চাটা কাঁদবে। দীপা দরজার দিকে পেছন ফিরে বসলো।

মাথার কাছে জানলাটা বন্ধ। সেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দীপার চোখে জল এসে গেল।

বর্ষার সময় এই জানলাটা বড্ড টাইট হয়ে যায়, একবার বন্ধ করলে আর খুলতে চায় না। অনেকবার জোরে ধাক্কাতে হয়।

মনীশ এই জানলাটা রোজ খুলতো শোবার আগে। এখান থেকে একটা পুকুর দেখা যায়। এখন থেকে কি রোজ চাঁদু বা কুশকে ডাকতে হবে জানলাটা খোলার জন্য!

রোজ? এ বাড়িতে আর কতদিন? বরানগরে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

পয়সার হিসেব করতে বসলো দীপা।

তার স্কুলের চাকরির মাইনে চার শো টাকা। তাও যদি চাকরিটা চলে না যায়। মনীশ বলেছিল, ঐ চাকরি ছেড়ে দিতে, ভাগ্যিস দীপা তখন কোনো চিঠি দেয়নি।

চার শো টাকার মধ্যে বাড়ি ভাড়াই সাড়ে তিন শো। কুশ বা চাঁদুর কোনো উপার্জন নেই। কিন্তু ওদের কলেজের মাইনে, ট্রাম-বাস ভাড়ার খরচ আছে। মনীশের কলেজে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড বিশেষ জমেনি, পাওয়া যাবে মাত্র সাড়ে তিন হাজার টাকা। সুরঞ্জনের কাছে মনীশের কিছুই পাওনা নেই। ওটা সুরঞ্জন এমনিই বলেছে। মনীশ যদি কিছু অনুবাদের কাজ করতো, তা কি দীপা জানতো না? বরং অন্যদের কাছে মনীশের কত ধার আছে কে জানে।

এখানে এই সংসার চালানো অসম্ভব।

দীপা বাপের বাড়িতে ফিরে যেতে পারে, কিন্তু কুশ আর চাঁদু কী করবে?

লেখাপড়া ছেড়ে চাঁদুকে ফিরে যেতে হবে গ্রামে। সেখানে নিজস্ব বাড়ি নেই, জমি নেই। গ্রামে ফিরে কী কাজ পাবে ও? লক্ষ লক্ষ বেকার গিস গিস করছে সারা দেশে। কে চাঁদুকে শুধু শুধু খেতে পরতে দেবে?

চেষ্টা করলে অবশ্য চাঁদু লোকের বাড়িতে রান্নার কাজ পেতে পারে। তাও ওর চেহারার জন্য সহজে কেউ বাড়িতে রাখতে চাইবে না।

কুশকে ফিরে যেতে হবে বর্ধমানের গ্রামে দিদি-জামাইবাবুর কাছে। দীপা যখন নার্সিংহোমে তখন ওঁরা দু'দিন এখানে এসে ছিলেন। তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হলো, ওখানে নাকি জমিজমা নিয়ে খুব গণ্ডগোল হচ্ছে। দিদি-জামাইবাবু তো এই অবস্থায় কুশকে সাহায্য করার কোনো প্রস্তাব দেননি।

কুশের তো আর কোনো যাবার জায়গাও নেই। ওখানেই ফিরতে হবে বাধ্য হয়ে। ওখানে জমি দখলের লড়াই চলছে, প্রবল রাজনৈতিক উত্তাপ। কোনো না কোনো পক্ষ নিতেই হবে। ঐ সব জায়গায় এ পক্ষ বা ও পক্ষের দু' একটি ছেলে প্রায়ই থ্যাঁতা ইঁদুরের মতন জলকাদার মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। খবরের কাগজে খবর বেরোয়, তাদের নামও কেউ মনে রাখে না।

বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়েছে, তাকে শুইয়ে দিয়ে দীপা তার কপালে একটা চুমু খেল। তারপর ব্লাউজের বোতাম বন্ধ করে সে আয়নার কাছে দাঁড়ালো।

চেহারাটা কি খুব খারাপ হয়ে গেছে? বরানগরে ফিরে গেলে সবাই করুণা করে বলবে, ঝোঁকের মাথায় একটা উটকো লোককে বিয়ে করে মেয়েটা প্রায় মরতে বসেছিল! তেলে আর জলে কখনো মিশ খায়!

মনীশের যদি অনেক টাকা থাকতো? যদি সে একটা মন্ত্রী হতো? তা হলেও কি তার বাপের বাড়ির লোক তাকে শূদ্র বলে অবজ্ঞা করতো? দীপার এক জ্যাঠতুতো ভাই মেম বিয়ে করেছে। কী তার খাতির। মেমরা বুঝি শূদ্র নয়? কত সুন্দর মন ছিল মনীশের, কোনোদিন কোনো মানুষের ক্ষতি চায়নি, এমনকি একদিন রজতদাকে পর্যন্ত নেমন্তন্ন করেছিল বাড়িতে। মনীশকে ওরা কেউ বুঝলোই না।

হঠাৎ আলো নিভে গেল, পাখা বন্ধ হয়ে গেল।

রান্নাঘর থেকে চাঁদু চেঁচিয়ে বললো, এই কুশ, দেশলাই দিয়ে যা, মোম জ্বালতে হবে!

অন্ধকারের মধ্যে দীপা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। কাল মাসের শেষ তারিখ, কালকের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতেই হবে যা-হোক একটা। আর কী করবার আছে?

শিয়রের জানলাটা এবার না খুললেই নয়। গরমে বাচ্চাটা জেগে উঠবে।

দীপা জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রথমে ঠেললো আস্তে করে। মনে হয় যেন স্ক্রু দিয়ে আঁটা। এমনিতে দুম দুম করে ঠেললে বড্ড শব্দ হয়। আগে

তাতে কোনো ক্ষতি ছিল না, তখন তো ঘরে একটা বাচ্চা ছিল না।

খাটের ওপর থেকে একটা তোয়ালে নিয়ে সেটা জানলায় চেপে ধরে এক হাতে মারতে লাগলো দীপা। এতে শব্দ কম হয়। তবু খুলছে না, কিছুতেই না। চাঁদুকে ডাকতে হবে ?

দীপা প্রাণপণে একবার চাপ দিতে জানলাটা আচমকা খুলে গেল, দীপা হুমড়ি খেয়ে পড়লো গরাদের ওপরে। তার মুখ দিয়ে শব্দ বেরিয়ে এলো, ওঃ মাগো !

চাঁদু আর কুশ ছুটে দরজার কাছে এসে বললো, কী হয়েছে, বৌদি, কী হয়েছে ?

দীপা পেছন ফিরলো, তার মুখে বিজয়িনীর হাসি।

অনেকখানি চাঁদের আলো ঘরে এসে পড়েছে। জানলা দিয়ে আসছে টাটকা হাওয়া। এক মুহূর্তে দীপা বদলে গেছে।

মানুষের জীবনের এক একটা বিশেষ উপলব্ধি হঠাৎ হঠাৎই আসে। তার বাঁধা-ধরা সময় নেই।

জানলাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে দীপা তার জীবনের একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পেল।

এতদিন দীপা ছিল মনীশের স্ত্রী। মনীশ এই সংসারের প্রধান অবলম্বন, ঝড়-ঝাপটা, বিপদ-আপদ সবই তার সামলাবার কথা ছিল। অনটনের সময় মনীশকে রোজগার বাড়াতে হয়েছে। সংসারের ব্যাপারে দীপার মতামত ছিল কিন্তু দায়িত্ব ছিল না। সে বড় জোর ভাবতো, পাখা কেনার পর রান্নার গ্যাস সিলিণ্ডার কেনার কথা। ঘর সাজাবার কথা। পয়সা বাঁচিয়ে সিনেমা দেখা। মাঝে মাঝে একটু ভালো খাওয়া-দাওয়া, মাসের একটা রোববারে মাংস।

কিন্তু এখন তিনজনের জীবন নির্ভর করছে তার ওপর। তার সন্তান আর দুই দেওর। সে হয়তো নিজের সন্তানকে নিয়ে পালিয়ে বাঁচতে পারে। সেখানে অপমান সহ্য করতে হবে, তবু বাঁচা তো যাবে।

তার বদলে এখানে থেকে গেলে তার জীবনের একটা সার্থকতা সে প্রমাণ করতে পারবে।

দীপা বললো, চাঁদু, কুশ, পাশের ঘরে চলো, তোমাদের সঙ্গে কথা আছে।

এ ঘরের চতুর্থ চেয়ারটি শেষ পর্যন্ত কেনা হয়নি। আর দরকার হবে না।

দরজার ধারের চেয়ারটায় বসে পড়ে দীপা বললো, তোমরা শুনেছো যে আমার বাপের বাড়ি থেকে আমাকে নিয়ে যেতে চাইছে ?

দু'জনেই চুপ।

দীপা ধমক দিয়ে বললো, কথা বলছো না কেন ? বসো আগে, তারপর

আমার কথার উত্তর দাও ! শুনেছো ?

দু'জনে চেয়ারে বসলো, তবু কোনো উত্তর দিল না। অর্থাৎ তারা জানে। দীপার মা তো তাদের শুনিয়ে শুনিয়েই এই কথা বলে গেছেন।

দীপা আবার জোর দিয়ে বললো, শুনেছো তবু আমাকে তোমরা কিছু বলো নি কেন ? তোমরা কি চাও আমি চলে যাই ?

কুশ বললো, বৌদি, এখানে আর কী করে থাকা যাবে ?

—কেন, যেভাবে এতদিন ছিলাম !

—এত বাড়ি ভাড়া, তাছাড়া তোমার ছেলে··· বৌদি, খোকনকে তো মানুষ করতেই হবে, তোমার চলে যাওয়াই উচিত।

—আমি চলে গেলে তোমাদের কী ব্যবস্থা হবে ?

চাঁদু বললো, সে আমাদের ঠিক একটা কিছু হয়ে যাবে। তুমি এত ভেবো না।

—কী ব্যবস্থা হবে সেটা আগে শুনি ?

দু'জনেই আবার চুপ। কুশ একদিন রাগ করে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, দীপা পরে জেরা করে জেনেছে যে সে শুতে যাচ্ছিল শিয়ালদা স্টেশানে ভিখিরিদের পাশে।

চাঁদুর বড়বাজারের সেই ঠিকানার বৃত্তান্তও দীপার জানা হয়ে গেছে। এই নিষ্ঠুর কলকাতা শহরে দুটি গ্রামের ছেলের জন্য কোনো জায়গা নেই। ভিখিরিদের জন্য অবশ্য ফুটপাথে অনেক জায়গা পড়ে আছে।

দীপার চোখে জল এসে যাচ্ছে, কিন্তু এখন দুর্বল হলে চলবে না।

সে বললো, আমার বাড়ির সবার অমতে তোমার দাদাকে বিয়ে করেছিলুম। তারপর আমরা সবাই মিলে ছিলুম এখানে। কষ্ট হতো নানারকম, কিন্তু আনন্দও ছিল। কী, ছিল না ? এখন তোমার দাদা নেই বলেই আমি বাপের বাড়ি চলে যাবো, আমাকে তোমরা এত স্বার্থপর ভাবো ?

—কিন্তু বৌদি, আমাদের এখানে চলবে কী করে ?

—সে ভাবনা তোমাদের ভাবতে হবে না।

—বাঃ, একথা বললে চলে ? আমরা ভাববো না ? কত খরচ হয় আমাদের আইডিয়া নেই ? দাদা আমাদের মাথার ওপরে ছিল ছাতার মতন, আমাদের কিছু টের পেতে দেয়নি।

—যেমন ভাবেই হোক আমরা চালাবো। না হয় এক বেলা খাবো। আমি এই ঠিক করেছি। তোমরা থাকতে চাও তো থাকো, না হলে অন্য কোনো ভালো

জায়গা পেলে চলে যেতে পারো।

—বৌদি, খোকনের কথাটা ভাববে না?

—আমি একলা ভাববো কেন? সে তোমাদের ভাইপো নয়, তোমরা ভাববে না? আমাদের থেকেও গরিবের বাড়ির বাচ্চারা মানুষ হয় না? শোনো, যদি সেরকম অবস্থা হয়, যদি আমি মরে যাই, তাহলে খোকনকে তোমরা মাদার টেরিজার কাছে দিয়ে এসো!

কুশ দীপার হাত চেপে ধরলো।

কুশ আর চাঁদুর যে মন-মরা ভাবটা ছিল এতদিন, সেটা কেটে গেল পরদিনই। ফিরে এলো স্বাভাবিক যৌবনের স্ফূর্তি।

দু' একদিনের মধ্যেই চেষ্টা-চরিত্র করে চাঁদু পাড়ার খবরের কাগজের ডিস্ট্রিবিউটারকে ধরে হকারের কাজ জোগাড় করে ফেললো। রোজ ভোরে উঠে সে তিরিশখানা খবরের কাগজ বিলি করে আসে। কাগজের সংখ্যা বাড়াতে পারলে তার কমিশনও বাড়বে।

চূড়ান্ত সংকটের সময় আস্তে আস্তে উপায় বেরোয়। কুশ একদিন কলেজ স্ট্রিটে সুরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতেই সেদিনই সেই দোকানে পার্টটাইম চাকরি পেয়ে গেল। কলেজের পর, বিকেল সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে সাতটা।

দীপার বান্ধবী অনীতা এসে একদিন জানালো যে স্কুল কমিটি দীপার চাকরিটা পার্মানেন্ট করেছে এবং তিন মাসের সবেতন ছুটি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিগগিরই দীপা চিঠি পেয়ে যাবে।

দীপা বললো, পৃথিবীতে ভালো লোকও আছে তাহলে, তাই না?

অনীতা খুব একটা খুশি নয়। সে বললো, এটা ওদের অনেক আগেই করা উচিত ছিল।

খোকনকে আদর করতে গিয়ে অনীতা বললো, ঠিক বাবার মতন হয়েছে, তাই না?

দীপা বললো, কী জানি, আমি বুঝতে পারি না।

—তুই এরকম একটা বিচ্ছিরি সাদা শাড়ি পরে থাকিস কেন রে, দীপা? আজকাল কেউ ওরকম পরে নাকি?

—একটাই আমার সাদা শাড়ি ছিল। অন্য শাড়িগুলো তো আর ফেলে দিতে পারবো না, পরতেই হবে!

—তুই আবার নিরামিষ-টিরামিষ খাওয়া শুরু করিস নি তো?

—মাছ খাবার পয়সা কোথায়?

—আমি কাল মাছ রান্না করে আনবো। আমার সামনে বসে খাবি!

—ভালো কথা, অনীতা, শোন, তোর বাড়িতে একটা হারমোনিয়াম দেখেছিলুম। সেটা তোর কাজে লাগে এখন?

—না। ওটা আমার ননদের ছিল। আমি তো বাজাতেই জানি না। কেন?

—ওটা আমাকে কিছুদিনের জন্য ধার দিবি? আমি একটা বাচ্চাদের গানের ইস্কুল খুলবো।

—গানের ইস্কুল খুলবি? কোথায়?

—আপাতত এখানেই। আট-দশজন বাচ্চাকে অনায়াসেই শেখাতে পারি বিকেলের দিকে।

—দীপা, তোকে একটা কথা বলবো! তুই মনীশবাবুকে সাহস করে বিয়ে করেছিলি, সেটা খুব বড় কথা নয়। তার চেয়েও অনেক বড় তোর এখনকার এই লড়াইটা।

—বেশি বেশি বলিস না। অবস্থার চাপে পড়লে সবাই এরকম করে।

—তবে আর একটা কথাও বলে রাখছি। তোকে কিন্তু অনেক দুর্নামও সহ্য করতে হবে। সে জন্য তৈরি থাকিস!

দীপা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, দুর্নাম, কিসের জন্য?

অনীতা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, সে এক সময় ঠিকই তোর কানে আসবে। এদেশের মানুষ তো জিভ নাড়ার সুযোগ পেলে ছাড়ে না!

সেই সন্ধেবেলা দীপার চাকরি পাকা হবার খবর শুনে চাঁদু আর কুশ লাফালাফি করতে লাগলো। ওরা ভুলেই গেল যে এটা এখনো শোকের বাড়ি। যৌবন অনেক কিছুই মনে রাখে না। সে-রাতে দারুন খিচুড়ি রান্না করলো চাঁদু।

চাঁদুর হাতের লেখা ভালো। সে গানের ইস্কুলের জন্য পোস্টার লিখে ফেললো চারখানা। ভোরবেলা কাগজ বিলি করার সময় সে বিভিন্ন দেয়ালে সেগুলো সেঁটে দিয়ে এলো।

অবিলম্বে চারটি বাচ্চা জুটে গেল দীপার ইস্কুলে। একশো কুড়ি টাকা রোজগার।

দীপার বাপের বাড়ি থেকে লোক আসে মাঝে মাঝে। কখনো তার খুড়তুতো বা মামাতো ভাই। দীপা তাদের মিষ্টি কথা বলে ফিরিয়ে দেয়। যাতে মা এসে জোরাজুরি না করে সেই জন্য দীপা একেবারে যাবো না বলে না। সে বলে, যাবো, কয়েকদিন পরে, ডাক্তার বলেছেন, এখন খোকনকে বেশি নাড়ানো-চাড়ানো ঠিক হবে না। অন্তত চার-পাঁচ মাস কাটুক। মাকে বলো, খোকন একটু

ভালো থাকলে আমি যাবো দেখা করতে।

মাস দেড়েক বাদে একদিন দীপার দাদা অমিতাভ নিজে এসে উপস্থিত হলো। তখন বিকেল চারটে।

কলেজের ছুটি পড়ে গেছে। কুশ চাকরি করতে যায়, চাঁদু এই সময় বাড়িতেই থাকে। দীপা তখন চাঁদুকে হারমোনিয়ামে সা রে গা মা তোলাচ্ছিল। চাঁদুর গানের চর্চা করার আগ্রহ হয়েছে। তার ধারণা, একদিন দীপার গানের ইস্কুলটা অনেক বড় হবে, অন্য জায়গায় বাড়ি ভাড়া নিতে হবে, চাঁদুও সেখানে গান শেখাবে। পাশ করে সাধারণ একটা চাকরি নেওয়ার চেয়ে এই কাজ অনেক ভালো।

হঠাৎ অমিতাভ এসে পড়ায় চাঁদু সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

অমিতাভ নার্সিং হোমে দু' একবার দীপাকে দেখতে গেলেও নিজে কখনো এ বাড়িতে আসেনি।

বেশ বড়সড় রাশভারি চেহারা অমিতাভর। ফর্সা গায়ের রং। নানারকম ব্যবসা করে সে বাড়ির অনেক টাকা উড়িয়েছে। এক সময় সে ভালো চাকরি করতো, কিন্তু চাকরিতে তার মন বসে না। আপাতত সে একটা বিস্কুটের কারখানা শুরু করেছে, সেটা মন্দ চলছে না।

ঘরে ঢুকে অমিতাভ চাঁদুর দিকে এমনভাবে তাকালো, যেভাবে ভৃত্য শ্রেণীর লোকদের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল চাঁদু।

অমিতাভ তার ব্যক্তিত্ব দিয়ে বোনকে জয় করতে এসেছে।

প্রথমেই সে জিজ্ঞেস করলো, ও কে?

দীপা বললো, আমার দেওর।

—তোর ক'জন দেওর?

—দু'জন।

—হুঁ। মা তোকে বারবার যেতে বলছেন, তুই যাচ্ছিস না কেন?

—কোথায়?

—আমাদের বাড়িতে, আবার কোথায়? এখানে এখন পড়ে থেকে আর কী করবি। মান-সম্মান বলে তো একটা ব্যাপার আছে!

—তোমাদের বাড়িতে যাবো কী করে? আমার ছেলেকে তো ফেলে যেতে পারবো না!

—ফেলে যাবি কেন, তাকেও নিয়ে যাবি! মা কি তাতে আপত্তি করেছেন?

—দাদা, আমার স্বামীকে তোমরা কোনোদিন স্বীকৃতি দাওনি। আমার ছেলে

তো তারই ছেলে। ওর পদবী দাস। ও তোমাদের বাড়িতে থাকবে কী করে?

—আর ওসব আজেবাজে কথা এখন তুই তুলছিস কেন? ছোট ছেলের কোনো দোষ নেই। ওকে নিয়ে চল, জিনিসপত্তর গুছিয়ে নে, আমার সঙ্গে চল!

অমিতাভ ছোট শিশুদের সম্পর্কে ওরকম দয়া দেখালেও সে এখনো একবারও দীপার ছেলের দিকে তাকায় নি। তার কাছে গিয়ে আদর করা তো দূরের কথা।

চাঁদু নানারকম হাতের কাজ জানে। সে কোথা থেকে কাঠ-কুটো জোগাড় করে খোকনের জন্য একটা দোলনা-বিছানা বানিয়ে দিয়েছে। খাটের পাশে সেটা থাকে। সেখানে খোকন এখন ঘুমোচ্ছে।

দোলনার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত সন্তানের মুখের ওপর থেকে কাল্পনিক মশা তাড়াতে তাড়াতে দীপা বললো, দাদা, তুমি বসো। চা খাবে?

অমিতাভ খাড়া পাহাড়ের মতন দাঁড়িয়ে রইলো। লম্বা লোকেরা বসে পড়লে ব্যক্তিত্বও খানিকটা খর্ব হয়। সে বললো, না, কিছু খাবো না। তুই তৈরি হয়ে নে। মা বলেছে...

—মাকে বলো, আমি এখন যেতে পারবো না। কিছুদিন পরে মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসবো।

—খুকি, কেন পাগলামি করছিস। যা হবার তা হয়ে গেছে, ওসব ভুলে যা। বাড়ির মেয়ে বাড়িতে ফিরে চল।

—না। এখনো আমার সময় হয়নি।

অমিতাভ কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা অস্থির ভঙ্গি করলো। তার সময়ের দাম আছে। সে ঘরের চারপাশটা তাকিয়ে দেখলো। দেয়ালে মনীশের একটা ছবি থেকে দ্রুত সরিয়ে নিল চোখ।

তারপর ব্রীফকেস থেকে কয়েকটা কাগজ বার করে বললো, ঠিক আছে, যখন যেতে ইচ্ছে হয় যাবি। এই কয়েকটা জায়গায় সই করে দে তো! এটা ঝুলে আছে অনেকদিন।

দীপা এরকমই কিছু আশঙ্কা করেছিল। তার দাদাকে সে চেনে। সে এমনি এমনি এতদূর আসবে না।

নিরীহভাবে সে জিজ্ঞেস করলো, ওগুলো কিসের?

—আমাদের বাড়ির পেছনের জমিটা বিক্রি হবে।

—ওতে আমি সই করবো কেন?

—তোর একটা সই দরকার। মা বলে দিয়েছেন...

—দাদা, এক সময় ঐসব দলিল-পত্তরে আমি বিনা দ্বিধায় সই দিতে রাজি ছিলুম। তখন আমার স্বামী বেঁচে ছিল। আমার কোনো দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু এখন সে নেই, আমার ছেলে আছে। তার ভবিষ্যতের কথা আমাকে ভাবতে হবে। বাবার সম্পত্তি বিক্রি করলে আমি কত টাকা ভাগ পাবো, সেটা আগে লিখে দাও!

অমিতাভ কঠোরভাবে তার বোনের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বললো, এখন এসব বুদ্ধি তোকে কে দিয়েছে? ঐ দেওর দুটো?

—তোমার আর আমার গায়ে একই তো রক্ত। আমার এইটুকু বুদ্ধি থাকবে না?

—আমাদের বাড়িতে তোকে একটা ঘর দেওয়া হচ্ছে। সেখানে গিয়ে থাকলে তোর কোনো খরচ লাগবে না। তাও তুই এই দলিলে সই করে দিবি না?

—না। কারণ, আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়ে আর কোনোদিনই থাকবো না!

—তোকে এত সব অফার দেওয়া হচ্ছে, তবু তুই কেন এখানে পড়ে থাকতে চাস তা আমরা বুঝি না তুই ভাবিস? অনেক কথা কানে আসছে, তাই আমি নিজে দেখতে এলুম।

—আমি এখানে থাকতে চাই, কারণ এটা আমার নিজের জায়গা।

—খুকি, তুই এটা বুঝিস না যে দু'দুটো হুমদো হুমদো ছেলের সঙ্গে এইটুকু একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে থাকলে লোকে তোকে বেশ্যা বলবে?

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিল দীপা।

তারপর সোজা চোখ তুলে বললো, আর কেউ বলুক বা না বলুক, তুমি তো নিজের মুখে বললে? এরকম খারাপ মেয়ের বাড়িতে তুমি আর কখনো এসো না!

এতবড় কথাটা বলে ফেলেই অমিতাভর অনুতাপ হয়েছে। হাজার হোক নিজের বোন। তাছাড়া স্ট্রাটেজি হিসেবেও এটা খুব ভুল।

এগিয়ে এসে সে দীপার মাথায় হাত দিয়ে আবেগের সঙ্গে বললো, দীপা, রাগের মাথায় বলে ফেলেছি, আমায় ক্ষমা কর। ভুল বুঝিস না, আমরা সত্যিই তোকে ভালোবাসি।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দীপা বললো, আমাকে তুমি ছুঁয়ো না। আমার ঘেন্না করছে। আমার ঘেন্না করছে।

॥ ৯ ॥

সুখে দুঃখে কেটে গেল আরও আধখানা বছর। নতুন বছর এসেছে, মনোরম শীত পড়েছে কয়েকদিন হলো।

দীপার সন্তানটি আট মাসে জন্মালেও স্বাস্থ্যবান হয়েছে বেশ। দীপারও শরীর সেরেছে, নিয়মিত সে সকালে ইস্কুলে যায়, বিকেলে গানের ক্লাস চালায়। এখন ছাত্র-ছাত্রী সাতটি।

এখনকার দিনে মানুষ মানুষকে যতটা সাহায্য করে তার চেয়ে বেশি করে সমালোচনা, কিংবা অকারণে বাধার সৃষ্টি। সব সময় পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে একটা অদৃশ্য যুদ্ধ চলছে, দীপা তা টের পায়। কিন্তু তাতে হার মানে না।

কিন্তু তার সবচেয়ে মুস্কিল হয় যখন কুশ আর চাঁদু ঝগড়া বাধায়। এমনিতে ওদের বেশ ভাব আছে, সংসারের ব্যাপারে সব সময় পরস্পরকে সাহায্য করে, পালা করে দীপার বাচ্চাকে দেখে। দু'জনের একজন সব সময় দীপাকে বাড়িতে পাহারা দেয় যাতে তার বাপের বাড়ির কেউ হঠাৎ এসে কোনো জোর-জবরদস্তি না করতে পারে।

কিন্তু কিসে যে হঠাৎ হঠাৎ ওদের সংঘর্ষ বেধে যায়, তা দীপা বুঝতে পারে না। ওটা যেন পুরুষদের একটা আলাদা জগতের ব্যাপার। দু'জনেই কণ্ঠস্বর সপ্তগ্রামে তুলে চ্যাচায়, দীপা মাঝখানে এসে দু'জনকে টেনে সরিয়ে দিয়ে বলে থামো, থামো!

ঝগড়া কখনো হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়নি এ পর্যন্ত। কুশ দু' একবার চাঁদুকে চড়-চাপড় মারলেও চাঁদু একবারও কুশের গায়ে হাত তোলে না। তার কারণ অসম গায়ের জোর। কুশ রোগা পাতলা, আর চাঁদুর বুক পাথরের মতন।

চাঁদুর শারীরিক শক্তি বেশি হলেও তার মনটা দুর্বল। মাঝে মাঝেই সে বিমর্ষ হয়ে যায়। ঝগড়া ছাড়াই এমনি এমনি। কখনো কখনো সে টানা দু'তিন দিন কীরকম যেন মুষড়ে থাকে, কারুর সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না।

দীপা বুঝতে পারে, চাঁদু কবিতা লেখে বলেই বোধহয় তার এরকম হয়। চাঁদুর কবিতার খাতাটা প্রায়ই সে পড়ে দেখে। চাঁদুর কবিতার অনেক উন্নতি হয়েছে। দু' একটা ছাপাও হয়েছে ছোট পত্রিকায়। তবু সেজন্য যেন তার কোনো আনন্দ নেই।

সেই যে মেয়েটি চাঁদুকে গায়ের গন্ধের জন্য অপমান করেছিল, সেই বর্ণা ভাদুড়ীকে চাঁদু ভুলতে পারেনি আজও। কুশ খবর আনে যে চাঁদু নাকি দুপুরের

কলেজ আরম্ভ হবার আগে থেকেই সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে, মর্নিং-এর মেয়েদের দেখবে বলে। সব মেয়ে নয়, বিশেষ একটি মেয়ে, সেই বালিগঞ্জের সোফিসটিকেটেড মেয়ে বর্ণা ভাদুড়ী।

কুশের এইসব বিশেষ সংবাদদাতার সংবাদ চাঁদু জোরালো ভাবে অস্বীকারও করতে পারে না।

সকালবেলা যে ছেলেটি খবরের কাগজের হকারের কাজ করে, তারপর বাড়িতে এসে রান্না করে, দুপুরে মলিন পোশাক পরে কলেজে যায়, তারও যে একটি রোমান্টিক কবি-হৃদয় আছে, তা অনেক মেয়েই টের পাবে না।

একদিন রাত্তিরে খাওয়ার টেবিলে বসে দীপা জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা চাঁদু, ঐ মেয়েটা তোমার নাম জানে?

চাঁদুর বদলে কুশ উত্তর দিল, জানবে না কেন? ওরা একসঙ্গে গানের রিহার্সাল দিয়েছে, নাম জানবে না? চাদু যে ওকে নিয়ে কবিতা লেখে তাও মেয়েটা জানে।

—তুমি কী করে জানলে?

—আমার সোর্স আছে। আমি সব খবর পাই, বৌদি! এই চেঁদোটাই ভ্যাবা গঙ্গারাম, কিছুই বোঝে না!

দীপা চাঁদুর হাতের ওপর হাত রেখে বললো, চাঁদু, তুমি অন্য মেয়ের সঙ্গে ভাব করতে পারো না? ও মেয়েটা ভাদুড়ী, ও চন্দ্রনাথ মাইতি-কে কোনোদিনই পাত্তা দেবে না! ভাদুড়ী মানে তো বামুন!

চাঁদু তবুও কোনো কথা বলে না। কুশ বলে, বৌদি, তুমি এই কথা বলছো, তুমি নিজেও তো—

দীপা হাসতে হাসতে বলে, সেইজন্যই তো আমি বামুনদের ভালো করে চিনি!

মনীশের সব জামা-কাপড় দীপা কুশ আর চাঁদুকে ভাগাভাগি করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে মনীশের কোনো প্রিয় পাঞ্জাবি পরা কুশ বা চাঁদুকে দেখলে দীপার ভ্রম হয়।

সময়ের নিয়ম অনুযায়ী এ বাড়িতে মনীশের উপস্থিতির উত্তাপ ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে।

চাঁদু আর কুশের উচ্চতা প্রায় একই রকম বলে ওরা জামা-টামা প্রায়ই বদলা-বদলি করে পরে। একদিন কুশ চাঁদুর জামার পকেট থেকে চল্লিশটা স্লিপিং পিল আবিষ্কার করলো। চাঁদু তখন স্নান করতে বাথরুমে ঢুকেছে। কুশ দীপার কাছে

এসে বললো, বৌদি, দ্যাখো।

দীপার বুক ধক ধক করতে লাগলো। এই ঘুমের বড়ি সে চেনে। চাঁদু এবং কুশও চেনে। মনীশের মৃত্যুর পরের কয়েকটা দিন দীপা যখন খুব বাড়াবাড়ি করছিল, তখন পাশের বাড়ির একজন ডাক্তার দীপাকে একটা-দুটো করে ঐ বড়ি খাইয়ে দিতেন।

চাঁদু কী করে এতগুলো ঘুমের বড়ি জোগাড় করলো, কী জন্যই বা জোগাড় করলো?

চাঁদু বাথরুম থেকে বেরুবার পর তাকে দু' পাশ থেকে আক্রমণ করলো কুশ আর দীপা। চাঁদুর অবস্থা ধরা-পড়া চোরের মতন। সে কোনো সদুত্তর দিতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত সে বললো, বৌদি, মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে। দাদার কথা মনে পড়ে। দাদা আমার জন্য কত কী করেছে। দাদা আশ্রয় না দিলে আমি রাস্তার ভিখিরি হয়ে যেতাম। দাদা আমাদের জন্যই খাটতে খাটতে... নিজের কোনো চিকিৎসাও করে নি। তাই এক এক সময় ইচ্ছে করে দাদার কাছে চলে যাই। দাদার একটু সেবা করি।

কথাটা শুনতে ভালো লাগলেও ঠিক বিশ্বাস হয় না। দীপার মন যুক্তিবাদী। একজন মানুষ প্রায় ন' মাস আগে মারা গেছে, তার কথা ভেবে একটি শক্ত সবল ছেলে মৃত্যু বরণ করতে চায়? না, এটা সত্যি বলে মানা যায় না!

কিন্তু যুক্তি দিয়েও তো পৌঁছোনো যায় না মনের গভীরে। এই সংসারটাকে কোনো রকমে জোড়াতালি দিয়ে চালাবার জন্য লড়াই করছে তিনজনেই, চাঁদুর তাতে উৎসাহের ঘাটতি নেই। তবু চাঁদু কেন মাঝে মাঝে বিমর্ষ হয়ে পড়ে? কিসের জন্য এই বিষাদ? এমনকি নিজের প্রাণটাও নষ্ট করতে চায়? চাঁদুকে যে দীপা এই ব্যাপারে কী ভাবে সাহায্য করবে তা বুঝে উঠতে পারে না!

সেই তুলনায় কুশকে বোঝা অনেক সহজ। তার বহির্মুখী মন। সে বাইরে যেমন হইচই করে, বাড়িতেও সেইরকম করতে ভালোবাসে। রাজনীতির সঙ্গে সে একেবারে সংস্রব ত্যাগ করেনি, যদিও কলেজ আর চাকরি দুটো এক সঙ্গে চালাবার জন্য সে এখন অন্যান্য ব্যাপারে বেশি সময় পায় না। রাজনীতি নিয়ে তর্ক করে আবার কুশ হিন্দী সিনেমার নায়িকাদের ছবিও জমায়।

দীপার ইচ্ছে করে বর্ণা ভাদুড়ী নামে মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করতে। কিন্তু তাকে সে কোথায় পাবে? সে বালিগঞ্জের মেয়ে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার বাড়ির ঠিকানা কেউ জানে না। দীপা তো আর চাঁদুদের কলেজের

সামনের রাস্তায় গিয়ে ঐ মেয়েটির জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না!

একদিন দুপুরে দীপা রান্না করছে, চাঁদু পড়াশুনো করছে নিজের ঘরে। পড়াশুনোয় চাঁদু এখন অনেক উন্নতি করেছে। প্রফেসার ধীরেন ঘোষের কোচিং-এ সে বিনা পয়সায় পড়তে যায়। মনীশই এই ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছে।

ছুটির দিন বলে কুশ গেছে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। সামনেই জেনারেল ইলেকশন, সে কিছু কিছু কাজ করছে তার পার্টির। খাওয়ার সময় কুশ ফিরে আসবে।

এক সময় চাঁদু বললো, বৌদি, আমি একটু বেরুচ্ছি!

দীপা অন্য কিছু চিন্তা করছিল, সে বললো, আচ্ছা।

একটু বাদে দীপা মুখ ফিরিয়ে দেখলো, রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে চাঁদু। তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। তার মুখখানা অন্যরকম।

সে আবার বললো, বৌদি, আমি চলে যাচ্ছি।

দীপা এখনও অন্যমনস্ক। সে বললো, আচ্ছা।

চাঁদু বেরিয়ে যাবার পাঁচ মিনিট বাদে দীপার খেয়াল হলো। চাঁদু দু'বার চলে যাবার কথা বললো কেন? তার মুখখানাতে কী যেন ছিল! সে কেন বললো, চলে যাচ্ছি!

দীপা দৌড়ে এলো চাঁদুদের ঘরে।

টেবিলের ওপর চাঁদুর কবিতার খাতা। তার ওপরে একটা ভাঁজ করা কাগজ গেলাস দিয়ে চাপা দেওয়া।

দীপার নামেই চিঠি।

বৌদি

আমি চলে যাচ্ছি। তোমরা আর আমার খোঁজ করো না। আমি মানুষ নামের যোগ্য নই। এ পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে আমার বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। তোমার আর মনীশদার স্নেহের কোনো প্রতিদান দিতে পারলুম না---।

পুরো চিঠিটা পড়লোও না দীপা। উনুনে কড়াইতে তরকারি চাপানো, দোলনায় খোকন একা শুয়ে আছে, সব ভুলে গিয়ে দীপা খালি পায়েই ছুট লাগালো।

সিঁড়ির পরে গলি, গলির পর বড় রাস্তা। বাস স্টপ সেখান থেকেও আর একটু দূরে, সিনেমা হলের কাছে। সেখানে নুন শো-র খুব ভিড়, তারই মধ্য থেকে বাস স্টপে দাঁড়ানো চাঁদুকে খুঁজে পেল দীপা।

চাঁদুর হাত চেপে ধরতেই সে কর্কশ স্বরে বললো, আমায় ছেড়ে দাও!

তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই!

দীপা বললো, চাঁদু, আমি চ্যাঁচাবো। আমি লোকদের বলবো তুমি আমার সর্বনাশ করে চলে যাচ্ছো।

—তোমার যা খুশি তাই করো!

—চাঁদু, খোকনকে বাড়িতে একলা রেখে এসেছি। তার যদি কিছু হয়ে যায়—

চাঁদু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল।

রাস্তায় অন্য লোকরা ব্যগ্র চোখে দেখছে এই নাটক। একটি খালি-পায়ে সুন্দরী যুবতী, আটপৌরে শাড়িতে হলুদের দাগ, আর একটি চাকরের মতন বা গুণ্ডার মতন চেহারার যুবক। হ্যাঁ, এ নিয়ে ভালো নাটক হয়। এর মধ্যে আবার কান্না রয়েছে।

তবে কলকাতার নাগরিকরা এইসব পথ-নাটক দেখে সহজে কোনো মন্তব্য করে না।

একটা চাকা লাগানো পুতুলের মতন চাঁদুকে টানতে টানতে নিয়ে এলো দীপা।

পাড়া-প্রতিবেশীরা জানলা দিয়ে দেখছে। একতলায় ভাড়াটেরা দেখলো। দেখুক। ওরা তো শুধু রসালো মন্তব্য করেই খুশি, ওরা কি কারুকে বাঁচতে সাহায্য করবে?

ওপরে এসে, দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দীপা প্রথমে খোকনকে দেখে এলো। তারপর চাঁদুর সামনে দাঁড়িয়ে বললো, এবারে বলো! কেউ তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে? আমি বা কুশ এমন কিছু বলেছি যাতে—

চাঁদু কাঁদতে কাঁদতে বললো, না, বৌদি, না? আমি তোমাদের স্নেহের অযোগ্য! আমার এরকম খারাপ চেহারা, আমি বেঁচে থেকে কী করবো? তুমি কেন আমায় ডেকে আনলে?

—চাঁদু, ছেলেমানুষী করো না। কী হয়েছে, সব বলো? তুমি আমাকে বলবে না? আমাকে বিশ্বাস করবে না!

—বৌদি, আমার বাঁচতে ইচ্ছে করে না!

—কেন?

—ঐ বর্ণা, সে আমার দিকে একবারও তাকায় না। আমি কতদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকি, আমি তো আর কিছু চাই না, শুধু একবার ও আমার দিকে তাকাবে···আমি এতই দেখতে খারাপ, মানুষ তো কুকুর বেড়ালের দিকেও···

দীপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলো, এই? হায় রে!

কুশ বা চাঁদুর চেয়ে দীপা অনেক বেশি লেখাপড়া করেছে, পৃথিবীর খবরও সে বেশি রাখে। পৃথিবীর অনেক দেশে ছেলেমেয়েদের সম্পর্ক কত সহজ স্তরে নেমে এসেছে। বিয়ে না করেও তারা একসঙ্গে থাকে। একজনের আর একজনকে পছন্দ হলে তার সামনে গিয়ে বলে, তুমি আমার হও!

আর এ দেশে এখনো এমন রোমান্টিক ছেলে আছে যে কোনো একটি মেয়ে তার দিকে শুধু তাকালো কিংবা তাকালো না, এই ভেবে আত্মহত্যা করতে যায়! কিংবা নিজের চেহারাটা খারাপ মনে করে সে ভাবে, সে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার যোগ্য নয়!

দীপা ঠিক করলো, বর্ণা ভাদুড়ী নামে অদেখা মেয়েটির সঙ্গে তার প্রতিযোগিতায় নামা ছাড়া উপায় নেই। চাঁদুর মন এখন খুবই দুর্বল। তাকে কিছু না কিছু তো দিতেই হবে।

সে গাঢ় চোখে তাকিয়ে বললো, চাঁদু, আমার চোখে তুমি সুন্দর। কী চমৎকার তোমার স্বাস্থ্য, গ্রীক দেবতাদের মতন, এজন্য তোমার গর্ব হওয়া উচিত। চাঁদু, আমাকে তুমি ভালোবাসো না?

ধরা গলায় চাঁদু বললো, বৌদি, তোমার চেয়ে আমি কারুকেই ভালোবাসি না। আমি অধম, আমি তোমার যোগ্য নই!

দীপা হাত বাড়িয়ে চাঁদুকে বুকে টেনে নিল। চাঁদু পাগলের মতন মাথা ঘষতে লাগলো সেখানে। দীপার দুই স্তন-বৃন্তে বার বার লাগছে চাঁদুর নাক। চাঁদু তাকে শক্ত করে চেপে ধরে আছে।

দীপা আবার ভাবলো, কিছু তো দিতে হবে!

একটু পরে সে চাঁদুর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, চাঁদু, আমায় নিয়ে কবিতা লিখবে না?

চাঁদু মুখ তুলে বললো, বৌদি, আমার সব কবিতাই তো তোমাকে নিয়ে, তা তুমি বোঝো না? বর্ণার কথা চিন্তা করলেই আমি তোমার মুখটা দেখতে পাই।

দীপা আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হেসে বললো, এইবার শুরু হলো কবিদের মিথ্যে কথা। আমি কবিদের চিনি। কলেজে পড়ার সময় এক কবির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল।

—কে, কে? নাম কী?

—সেরকম নাম-করা কেউ নয়। শোনো, পেঁপের তরকারিটা কিন্তু পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। ওটাই খেতে হবে!

একটা সাধারণ কথায় কেটে গেল রোমান্টিকতার ঘোর। অপরাধীর মতন

মুখ করে চাঁদু বললো, বৌদি, আমি কোনো অন্যায় করেছি?

দীপা বললো, নিশ্চয়ই করেছো! এখন থেকে আমার কাছে কোনো কথা গোপন করবে না! তা হলে কিন্তু আমি তোমাকে আর একটুও ভালোবাসবো না। আজ কোথায় যাচ্ছিলে?

মৃদু হেসে চাঁদু বললো, রেললাইনে!

এর পর মাঝে মাঝেই চাঁদুর কবিতা পড়ে তারিফ করবার জন্য তার মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে আদর করে দীপা। কখনো সীমা ছাড়ায় না। তার নিজেরও যে ভালো লাগে না তা নয়। এক এক সময় সে ভাবে, কোনোদিন যদি চাঁদু সীমা ছাড়িয়ে যেতে চায়, তখন কী হবে? সে তখন দেখা যাবে। বাঁচবার জন্য, অন্যকে বাঁচাবার জন্য মানুষকে কত কী করতে হয়!

কুশের জন্যও একদিন একটা কাণ্ড হলো।

চাঁদু আর দীপার মধ্যে যে সম্পর্কটা চলছে, সেটা কুশ ঠিক লক্ষ্য করে নি। বাইরের জীবন নিয়েই সে বেশি ব্যস্ত।

কলেজ স্ট্রিটে সুরঞ্জনের দোকানের আড্ডার কথা আগে দীপা শুনতো মনীশের কাছ থেকে, এখন কুশ নানা গল্প বলে।

একদিন কুশ বললো, বৌদি, আমাদের দোকানে রজতদা আসে, তুমি চেনো তো?

দীপা মাথা নাড়ে।

—রজতদা একদিন আমাদের বাড়িতে আসতে চায়। তোমাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছে।

দীপা এবারে দু'দিকে নিষেধসূচক মাথা নাড়লো।

—তুমি আসতে বারণ করছো? কেন? রজতদা ভালো লোক। খুব ভদ্র। তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইছে।

দীপা বললো, কুশ, আমরা তিনজনে তো বেশ আছি। এখানে বাইরের লোক আনবার কী দরকার?

কথাটা কুশের মনে লাগলো। সে বললো, এটা ঠিক বলেছো! কী দরকার বাইরের লোক আসবার!

দীপা অবশ্য মনে মনে হাসছে। রজতদা যে ভদ্রলোক তা সে কুশের কাছ থেকে আর কী জানবে! সে নিজেই তো জানে। রজতদার ভদ্রতা এমন চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছেছে যে দীপার সঙ্গে দেখা করবে কি না সে জন্যও সে কুশের মারফত অনুমতি চায়। এমন ভদ্রলোককে দীপার কোনো দরকার নেই।

সেদিন মাসের সাতাশ তারিখ। কারুর কাছে আর একটিও পয়সা নেই। তোষকের নিচে দীপার সেফ ডিপোজিট ভল্ট নিঃশেষ। কুশকে কাল কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে। তারপর যদি দোকান থেকে কিছু অ্যাডভান্স পাওয়া যায়।

একেবারে না খেতে পাওয়ার মতন অবস্থা নয়। চাল, ডাল, তেল, নুন সবই কিছু কিছু আছে। আগের দিন আলুর দম রাঁধবার সময় দীপা আলুর খোসাগুলো ছাড়িয়ে আলাদা করে রেখে দিয়েছিল। সেই আলুর খোসা ভাজাই ডাল-ভাতের সঙ্গে একটি উপাদেয় আইটেম হতে পারে।

রান্না প্রায় শেষ, একটু পরেই খেতে বসা হবে, এই সময় নিচের দরজায় দুম দাম শব্দ। কয়েকজন একসঙ্গে ডাকলো, কুশ! এই কুশ।

রাত দশটা বাজে। কীরকম যেন জড়িত কণ্ঠস্বর, মাতাল বলে মনে হয়। আজকাল এরকম ডাক শুনলেই ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে।

দীপা কুশের দিকে তাকাতেই সে বিবর্ণ মুখে হাত জোড় করে বললো, বৌদি, বিশ্বাস করো, আমি আর ওদের সঙ্গে মিশি না, মিশতে চাই না। কিন্তু ওরা আমায় ছাড়বে না!

—ওরা কারা?

—আমার আগের পার্টির ছেলেরা। ইলেকশান এসে গেছে তো, ওরা চায় আমাকে দিয়ে পোস্টারিং করাতে। বুঝলে। আমি বললুম, আমি এখন চাকরি করছি, আমার টাইম নেই, তবু ওরা শুনবে না।

চাঁদু বললো, কয়েকটা পোস্টার মারার ব্যাপার যদি হয়, তা হলে মেরে দিলেই পারিস!

কুশ বললো, তুই বুঝতে পারবি না। এ পাড়ায় অপনেন্ট পার্টি খুব স্ট্রং। আমি অনেক আগে ঐ দলেই ছিলুম। আমি পোস্টারিং করতে গেলেই ওরা আমাকে ঝাড়বে! পেটো, ফেটো রেডি!

—কেন এসব ঝামেলার মধ্যে যাস, কুশ?

—বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। আমি ছাড়তে চাইলেও যে ওরা ছাড়বে না!

নিচের তলায় ছেলেগুলো ডেকেই যাচ্ছে। একতলার ভাড়াটেরা ভয়ে দরজা খুলছে না। কিন্তু ওরা তো ফিরে যাবে না।

দীপা বললো, চাঁদু, তুমি ওদের বলো, কুশ কলকাতায় নেই। আর কুশ, তুমি আমার ঘরের খাটের তলায় লুকোও।

কুশ বললো, তুমি ওদের চেনো না, বৌদি। ওরা ফার্স্টে এসেই টর্চ মেরে

খাটের তলা আর পায়খানা দেখবে।

শীতকাল, বিছানায় লেপ পাতা। সেই জন্য কুশের জন্য অন্য ব্যবস্থা হলো। দীপা গিয়ে বিছানায় লেপ ঢাকা দিয়ে ছেলেকে কোলে নিয়ে বসলো। কুশ লুকোলো সেই লেপের তলায়।

চাঁদু বারান্দা দিয়ে মুখ ঝুঁকিয়ে বললো, কে? কুশ তো নেই, দেশে গেছে!

তলা থেকে এক তেজী মাতাল বললো, এই শালা, দরজা খোল! এতক্ষণ কী করছিলি?

চাঁদু নিচে গিয়ে দরজা খুলতেই তিনটি ছেলে তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এলো ওপরে। একজন তার কলার চেপে ধরে বললো, তুই শালা কে রে? কুশ কোথায়? সে শালা একশোখানা পোস্টার মেরে দেবে কথা দিয়েছিল।

যারা নির্বাচনের জন্যে খাটে, তারা সবাইকে চেনে। ওদের একজন বললো, এর নাম তো চাঁদু, কুশের এক ভাই হয়!

দলনেতাটি বড্ড বেশি মাতাল হয়ে গেছে। সব মুখ তার মনে নেই। সে ফিক ফিক করে হেসে বললো, চাঁদু? এর নাম চাঁদু? এ যে দেখছি মাইরি কালো চাঁদিয়াল! দেড়তে ঘুড়ি। কড়ি টানা বুক।

ঘুড়ির উপমাটা অন্য একজনের পছন্দ হলো না। সে বললো, এ এক শালা বুনো মোষ। সকালে কাগজ ছুঁড়ে দেয়।

বুনো মোষের সঙ্গে কাগজ ছুঁড়ে দেবার কী সম্পর্ক তা সে জানে, তবু অন্যরা হেসে উঠলো।

তৃতীয় জন টর্চ জ্বেলে রান্নাঘর, বাথরুম, চাঁদুদের ঘর দেখে আসবার পর দীপার ঘরের দরজা ঠেলবার আগেই চাঁদু বললো, এই দাঁড়াও। কুশ দেশে গেছে। পোস্টার মারবার ব্যাপার তো। আমাকে দাও, আমি কালই সব কটা মেরে দেবো।

দলপতি টলতে টলতে চাঁদুর সামনে এসে বললো, তুমি মেরে দেবে? সত্যিই দেবে?

চাঁদু বললো, কেন দেবো না। কথা দিচ্ছি যখন নিশ্চয়ই দেবো।

দলপতি চাঁদুর বুকে থাবড়া মেরে বললো, কালোমানিক? না, না, কালাচাঁদ। তোমাকে আমাদের পরে কাজে লাগবে। কিন্তু কুশ হারামজাদা লুকিয়ে আছে কিনা সেটা আমাদের জানার দরকার। কী বলো, কালোমানিক, ধুড়ি, কালাচাঁদ?

লাথি মেরে সে দীপার ঘরের দরজা খুলে দিল।

তারপরেই সে দেখলো ক্লাসিকাল মাতৃমূর্তি। কোমর পর্যন্ত লেপ দিয়ে ঢাকা,

দীপা তার ব্লাউজের বোতাম খুলে তার সন্তানকে স্তন্য পান করাচ্ছে।

একেবারে হাড়-পোড়া শয়তান ছাড়া এমন দৃশ্যে সবাই অভিভূত হয়। এ পাড়ার মাতাল নেতাটি তো চুনোপুঁটি। প্রথার থেকে মুখ ফেরাবার সাহসও তার নেই।

সে জিভ কেটে বললো, এ মা ছি ছি, বৌদি, আপনাকে ডিসটার্ভ করলুম। মাপ করবেন।

তারা চলে গেল, চাঁদু গেল নিচ পর্যন্ত তাদের পৌঁছে দরজা বন্ধ করতে।

দীপার গা শিরশির করছে। রোগা পাতলা কুশ লেপের তুলায় লুকিয়ে আছে। ওরা বুঝতে পারেনি। কিন্তু ওরা চলে যাবার পরও দীপা স্বস্তি বোধ করতে পারছে না। তার বুক কাঁপছে।

লেপের তলায় কুশ জড়িয়ে ধরে আছে তার উরু। কুশের স্পর্শে তো সেরকম কোনো লোভ নেই, কিন্তু শুধুমাত্র ন'মাস পরে ঐ গোপন স্থানে কোনো পুরুষের ছোঁওয়ার জন্যই দীপার একরকম তীব্র সুখানুভূতি হচ্ছে। দীপা কিছুতেই তা অস্বীকার করতে পারছে না। শুধু দেওয়া নয়, তারও তো কিছু পাওয়া দরকার।

খোকনকে দোলনায় শুইয়ে দিয়ে সে হাত বাড়িয়ে কুশকে ওপরে তুলে এনে বললো, এসো, ওরা চলে গেছে।

কুশ উঠে এসে দু' হাতে জড়িয়ে ধরলো বৌদিকে।

দীপার খুব ইচ্ছে করলো, বুকের বোতাম খোলাই আছে—এখনও টনটনে ভাব যায়নি, কুশ যে-কোনো একটি স্তনে মুখ দিক। অতি কষ্টে ইচ্ছেটা দমন করে সে কুশের চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললে, কুশ, কেন আমাদের এমন দুশ্চিন্তায় ফেলো।

কুশ বললো, আমি আর কোনোদিন যাবো না বৌদি।

—তুমি জানো না, তোমার জন্য আমার কতটা চিন্তা হয়?

—জানি। তুমি এইবার থেকে দেখো!

—তোমার লজ্জা করে না, তুমি মেয়েদের আঁচলে মুখ লুকিয়ে পলিটিকস্ থেকে পালাচ্ছো? ওরা যদি আজ বুঝতে পেরে যেতো...

এ কথার উত্তর না দিয়ে কুশ দীপার তলপেটের কাছে মাথা ঘষতে লাগলো। দীপা কোনো বাধা দিল না। তার ভালো লাগছে। সে কুশকে অনেকখানি তরল করে দিল শরীর।

চাঁদু ওপরে ফিরে এসেছে, সেই শব্দ পেয়েই দীপা ডাকলো, চাঁদু, এদিকে এসো!

চাঁদু দরজার কাছে এসে কুশকে দীপার বাহুবন্ধনে দেখে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

দীপা বললো, চাঁদু, এখানে এসো, তুমি আমার পাশে একটু শোও!

চাঁদু বললো, এখন থাক বৌদি। আমি ভাবছি...

—চাঁদু, এসো!

মন্ত্রমুগ্ধের মতন চাঁদু এসে শুয়ে পড়লো। দীপার এক হাত কুশের মাথার চুলে। অন্য হাত সে রাখলো চাঁদুর বুকে। চাঁদুর বুকটাই বেশি খাঁক হয়।

সে বললো, চাঁদু, সেই গানটা গাও তো, চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে...

গানটা করুণ সুরের। গানটা শেষ হওয়া মাত্র কুশ বিছানা থেকে নেমে বললো, চল, চাঁদু, আমরা রান্নাটা শেষ করি। ততক্ষণে বৌদি খোকনকে দুধ খাইয়ে নিক।

তারপর ওরা দু'জনেই খোকনকে আদর করতে করতে দীপার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

॥ ১০ ॥

সকালে খবরের কাগজ বিলি করে ফেরার পথে চাঁদু প্রায়ই কিছু ফুল জোগাড় করে আনে। এদিকে দু'একটা বাড়িতে এখনও বাগান রয়ে গেছে, কিছু কিছু ফাঁকা জমির আগাছাতেও ফুল ফোটে।

সেই ফুল দিয়ে মালা গেঁথে চাঁদু ঝুলিয়ে দেয় মনীশের বাঁধানো ছবিতে। দীপা এই ব্যাপারটা খুব একটা পছন্দ করে না, মুখে কোনোদিন আপত্তিও জানায় নি। মনীশ নেই, মনীশ আর কোনোদিনই ফিরবে না, এটা যে একটা অবধারিত সত্য! এক এক সময় মনীশের ওপর তীব্র অভিমান হয় দীপার। তার শরীরে একটা অসুখ বাসা বেঁধেছিল, সে কথা সে ঘুণাক্ষরেও জানায়নি দীপাকে? এই তার ভালোবাসা? দীপার কাছে সে আর কোনো কথা গোপন করতো না, কিন্তু সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথাটাই গোপন করে গেছে? হার্টের সামান্য গণ্ডগোল, আগে থেকে সাবধান হলে, ভালো কোনো ডাক্তারের পরামর্শ নিলে, অনায়াসেই অন্তত আরও কুড়ি পঁচিশ বছর আয়ু পাওয়া যেত!

মনীশ মাঝে মাঝে নিজের বুকে হাত বুলোতো; দীপার ধারণা ছিল, সেটা ওর মুদ্রাদোষ। কখনো কিছু জিজ্ঞেস করলে হেসে উড়িয়ে দিত। কেন যে দীপা আরও একটু মনোযোগ দেয়নি মনীশের স্বাস্থ্যের প্রতি, সে জন্য তার নিজের গালে চড় মারতে ইচ্ছে করে। মানুষটা চাপা ছিল খুব, নিজের কথা বিশেষ কিছুই বলতো না। নতুন সংসার পাতার পরেই টাকা পয়সা নিয়ে দুশ্চিন্তা...টিউশানি

করা তার পছন্দ ছিল না, তবু তিনটে টিউশানির জন্য রোজ দৌড়োনো···

যখন একা থাকে, তখন হঠাৎ হঠাৎ মনীশের কথা মনে পড়লেই দীপার চোখ জলে ভরে আসে। এখনও সব জায়গায় মনীশের চিহ্ন ছড়ানো। জীবনে মনীশ প্রায় কিছুই পেল না। সে ভালোবাসতো শুয়ে শুয়ে বই পড়তে, রান্না ঘরে উবু হয়ে বসে দীপার সঙ্গে গল্প করতে, তার নিজের মা বাবা নেই অনেকদিন, দীপাদের পরিবার তাকে চিনলো না···

কুশ আর চাঁদু কখনো মনীশের প্রসঙ্গ তোলার চেষ্টা করলে দীপা অবশ্য চাপা দেবার চেষ্টা করে। মনীশ নেই, সর্বক্ষণ মনীশের স্মৃতি জাগিয়ে রাখা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। এই পৃথিবীটা জীবিত মানুষের জন্য।

দীপার বেশ কিছুদিন কিছুই খেতে ইচ্ছে করতো না। মনীশের কথা মনে পড়লেই তার গলা যেন আটকে যেত। এখন দীপা বুঝেছে, তার শরীরটা ভাঙলে চলবে না। এই সংসারটাকে ঠিক মতন চালানোর জন্য তার স্বাস্থ্য ঠিক রাখা দরকার। সে এখন জোর করে নিজেকে খাওয়ায়। মনীশ বেগুন ভাজা ভালোবাসতো খুব, মাসের পর মাস এ বাড়িতে আর বেগুন ভাজা হয় নি। কুশ বা চাঁদু বেগুন আনতো না বাজার থেকে, দীপাই এখন ওদের বেগুন আনতে বলে।

কুশের চেয়ে চাঁদুই বেশি বলে মনীশের কথা। মনীশ সাহায্য না করলে চাঁদু এ শহরে টিকতে পারতো না। চাঁদু প্রায়ই মন-মরা হয়ে থাকে। দীপা ভাবে, শুধু নিজের সন্তানটিকেই নয়, এই দুটি যুবককেও ঠিক মতন জীবনমুখী করা তার দায়িত্ব। ওরা এখনও যেন বেঁচে থাকার ঠিক মতন একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পায় নি, অন্ধের মতন হাতড়াচ্ছে। চাঁদু কবিতা লিখতে চায়, কিন্তু এমনি এমনি কি কবিতা লেখা যায়, অনেক কিছু পড়তে হবে না? মাঝে মাঝে লেখে আবার মাঝে মাঝেই সব ছিঁড়ে ফেলে। দীপা চাঁদুকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকলে ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট হওয়া যায় না। নিজেকে সব সময় তৈরি করতে হয়, প্রথমেই দরকার আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে তোলা।

কলেজের পর আবার চাকরি করে, তাই কুশ বাড়িতে থাকে খুব কম সময়। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা না করলে তারা আর ঘাঁটায় না। কুশের ভাবভঙ্গিও বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। আর চাঁদু কলেজের সময়টুকু ছাড়া বাকি সময়টা বাড়িতেই কাটায়। তার কোনো বন্ধু নেই। দীপাকে সে প্রায় কিছুই সংসারের কাজ করতে দিতে চায় না। এমনকি সে প্রত্যেকদিন বালতি-ন্যাতা নিয়ে ঘর মুছবেই। দীপার ঘর মোছার অভ্যেস নেই, আগে একটা ঠিকে ঝি ছিল, সে-ই এসব করতো, এখন

ঝি রাখবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু চাঁদু রোজ ঘর মুছবে, এটাও পছন্দ হয় না দীপার। অন্য কেউ দেখলে ভাববে, চাঁদুকে বুঝি ঠাকুর-চাকর হিসেবে রাখা হয়েছে। কিন্তু তা তো নয়, চাঁদু এই পরিবারেরই একজন।

সেইজন্য চাঁদুর আপত্তি সত্ত্বেও দীপা এক একদিন জোর করে ঘর মুছতে চায়। চেষ্টা করলে মানুষ সবই পারে, ঘর মোছাই বা এমনকি শক্ত ব্যাপার? কিন্তু সেই সময় দু'জনে প্রায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ বেঁধে যায় বলতে গেলে। চাঁদু কিছুতেই দীপাকে ঐ কাজ করতে দেবে না। শেষ পর্যন্ত দীপা চাঁদুকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলে, আমার গায়ে হাত দেবে না, চাঁদু! সরে যাও, সরে যাও বলছি!

দীপা দুটি ঘরই মুছে ফেলে বালতি টেনে টেনে, চাঁদু অপরাধীর মতন তার পাশে পাশে ঘোরে।

চাঁদু বাচ্চাও ম্যানেজ করতে পারে ভালো। খোকনকে সে কোলে নিয়ে খাওয়ায়, খোকন তার গায়ে হিসি করে দিলেও সে কিছু মনে করে না। সে গান শুনিয়ে খোকনকে ঘুম পাড়ায়। চাঁদু না থাকলে একই সঙ্গে বাচ্চাকে সামলানো ও সংসার চালানো দীপার পক্ষে সম্ভব হতো না।

চাঁদু যে বেশিক্ষণ বাড়ি থাকে, দীপাকে সবরকম সাহায্য করে, দীপার পাশাপাশি ছায়ার মতন ঘোরে, তার যে অন্যরকম একটা বিশেষ কারণ আছে, তা দীপা জানে। হয়তো চাঁদু নিজেও সেটা সচেতনভাবে বোঝে না বা জানে না। কিন্তু মেয়েদের এসব ব্যাপার বুঝতে ভুল হয় না।

বাইরে কোনো বন্ধু নেই চাঁদুর, নিজের মা ছাড়া আর কোনো মেয়ের সাহচর্য পায়নি কখনো, সেই ক্ষুধাটা সে দীপার কাছে মেটাতে চায়।

মাঝে মাঝে ভয় করে দীপার। বন্ধুত্ব ও সাহচর্য সে দিতে পারে চাঁদুকে, কিন্তু তারপর? এক একদিন দুপুরে সারা পাড়া একেবারে শুনশান হয়ে থাকে, কুশ বাড়িতে থাকে না, খোকন ঘুমিয়ে থাকে, তখন হঠাৎ হঠাৎ চাঁদু ঢুকে আসে দীপার ঘরে। সে সামান্য ছুতো করে আসে, কিন্তু তার চোখ-মুখের চেহারা অস্বাভাবিক দেখায়। দীপার বুক কেঁপে ওঠে। ছেলেটা হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়ে যদি তাকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করে?

একদিন একটু বাড়াবাড়ি হলো। সেই দুপুরে অস্বাভাবিক গরম। খোকনকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে দীপা আর একবার স্নান করতে গেল, খোকন দু'বার হিসি করে তার শাড়ী ভিজিয়েছে। খোকনের জন্য বেশি জল লাগে বল রোজই দুপুরে রাস্তার টিউবওয়েল থেকে দু'বালতি জল এনে দেয় চাঁদু। টিউবওয়েলের ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে বড় আরাম লাগে।

সাড়ে তিনটের সময় আবার কলের জল আসবে, তাই দু' বালতি জলই খরচ করে ফেললো দীপা। অন্য শাড়ী আনেনি, ভিজে কাপড়েই সে বেরুলো বাথরুম থেকে। ঠিক দশ পা দূরে শোওয়ার ঘর। শট্ করে দীপা সে ঘরে ঢুকে যাবে।

বাথরুমের দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে চাঁদু।

সামান্য একটা টিনের দরজা। এদিক ওদিক ফাঁক-ফোকর আছে। পাশের দিকটা দিয়ে আলো ঢোকে। বাথরুমের মধ্যে সমস্ত জামা-কাপড় খুলে স্নান করা অভ্যেস দীপার। বাইরে চাঁদুকে দেখে প্রথমেই তার মনে হলো, চাঁদু কি কোনো ফুটোয় চোখ লাগিয়ে তার স্নানের দৃশ্য দেখছিল?

যদি দেখেও থাকে, তবু সে লজ্জা পেয়ে এখনো সরে যাচ্ছে না। এখনও দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গায়, প্রায় দীপার যাবার পথ আটকে।

মুখখানা লাল হয়ে গেলেও দীপা জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার, চাঁদু?

চাঁদু দীপার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে শুধু বললো, বৌদি···।

দীপার বুক টিপটিপ করছে, যদি চাঁদু তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, দীপা ওর সঙ্গে গায়ের জোরে পারবে না। দীপা চ্যাঁচাতে পারবে না। তাহলে সেটা হবে তার চূড়ান্ত পরাজয়।

দু'জনে তাকিয়ে রইলো দু'জনের চোখের দিকে। দীপার মথার চুল থেকে জল ঝরছে, ভিজে শাড়ীটা সেঁটে আছে গায়ের সঙ্গে, দীপা নিজের হাত তুলে তার বুক চাপা দেবারও চেষ্টা করলো না, যেন সামান্য নড়াচড়াতেই সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে যাবে।

কত পল-অনুপল-মুহূর্ত কেটে গেল কে জানে! দু'জনে তাকিয়ে রইলো দু'জনের দিকে।

তারপর এক সময় দীপা অনুভব করলো, চরম মুহূর্তটা কেটে গেছে। আর ভয় নেই। সে নরম গলায় জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে, চাঁদু?

চাঁদু কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, বৌদি, আমার মতন মানুষের বেঁচে থেকে কী লাভ বলতে পারো?

মিষ্টি হেসে দীপা বললো, হ্যাঁ বলতে পারি। তুমি একটু সরো, আমি মাথা মুছে, শাড়ীটা বদলে আসি···

চাঁদু আর কোনো কথা না বলে চলে গেল নিজের ঘরে। দীপা খানিকবাদে চুলটুল আঁচড়ে এসে দেখলো, চাঁদু কখন যেন বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে।

সেদিন চাঁদুর ব্যাপারটা নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবলো দীপা। হয়তো সে বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলছে। চাঁদুর চরিত্রে খানিকটা পাগলামির বীজ আছে নিশ্চিত।

কোনদিন যে সে ব্যালান্স হারিয়ে ফেলবে তার ঠিক নেই। এই ধরনের ছেলেরাই হঠাৎ খুন করে ফেলতে পারে কিংবা আত্মহত্যা করে। ঝোঁকের মাথায় সে যদি কখনো দীপার ওপরে বলাৎকার করে বসে, তা হলে তারপরেই ক্ষোভে, লজ্জায়, গ্লানিতে তার পক্ষে আত্মহত্যা করাও খুবই সম্ভব।

তা হলে এখনই কি চাঁদুকে দূরে সরিয়ে দেওয়া উচিত নয়? একটু ইঙ্গিত করলেই চাঁদু চলে যাবে এ বাড়ি থেকে। সে আত্মসম্মানজ্ঞানটুকু অন্তত তার আছে। কিন্তু কোথায় সে যাবে? কলকাতায় তার আর কোনো জায়গা নেই। কলেজের পড়া আর সে চালাতে পারবে না। গ্র্যাজুয়েটও হতে পারবে না। অন্তত পার্ট টু পাশ করলেও সে গ্রামে ফিরে গিয়ে একটা মাস্টারি পেতে পারতো!

দীপা কি নিজের নিরাপত্তার চিন্তায় চাঁদুর ভবিষ্যৎটা নষ্ট করে দেবে? চাঁদু তো সত্যি সত্যি তার ওপর শারীরিক আক্রমণ করেনি এখনও। বাথরুমের দরজার ফুটোয় চাঁদু চোখ লাগিয়ে ছিল কিনা, সে ব্যাপারেও দীপা নিশ্চিত নয়। কবিরা এরকম একটু একটু পাগলাটে হয়ই। তারা অদ্ভুত অদ্ভুত দুশ্চিন্তায় ভোগে। চাঁদুর মনটা যে খুব নরম, তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই।

চাঁদু এ বাড়ি থেকে চলে গেলে আরও একটা বিপদ আছে। শুধু কুশ আর সে কি এই ফ্ল্যাটে থাকতে পারে? দেওর আর বৌদি? চতুর্দিকে নিন্দুকদের জিভ লকলক করবে না? হয়তো বাড়িওয়ালা এসেও আপত্তি করবে। বাঙালী সমাজে এরকম চলে না। কুশ আর চাঁদু দু'জন আছে, এখন তবু অন্যরকম।

কুশ বাইরের বন্ধুদের সঙ্গে মেশে, কলেজে তার কয়েকজন বান্ধবী আছে, বৌদিকে সে ভক্তি করে, এ সবই ঠিক। কিন্তু চাঁদু চলে গেলে সে আর কুশ রাত্তিরে এক ফ্ল্যাটে···না, তাতে কুশের ওপরই অবিচার করা হবে, রাত্রির অন্ধকার মানুষকে বদলে দেয়···।

দীপা জানে, কখনো যে যদি চাঁদুকে একটু শারীরিকভাবে আদর করে, সে ধন্য হয়ে যায়। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দেওয়া, চিবুক ধরে, ওমা, কী সুন্দর, হেসে বলা, তাতেই চাঁদুর শিহরণ হয়। দীপা যদি কখনো তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কিংবা একটা চুমু খায়, তাতে ক্ষতি কী? দীপার সেরকম কিছু নীতির শুচিবাই নেই। সে এইটুকু করলে যদি চাঁদুর উপকার হয়, চাঁদুর ক্ষ্যাপামি কিছুটা কমে, তাহলে দীপা রাজি আছে, কিন্তু পুরুষ মানুষ কি ঐটুকুতে থামে? একটু প্রশ্রয় পেলেই চাঁদু যদি সবটা চায়?

চাঁদু কিংবা কুশ, এই দু'জনের কারুর সঙ্গেই দীপা শয্যা-সম্পর্কের কথা

কল্পনাও করতে পারে না। সে মনীশকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল, আবার ভবিষ্যতে যদি কারুর সঙ্গে ভালোবাসা হয়, সে মনটাকে খোলা রাখবে। চাঁদু আর কুশের সে বন্ধু হতে পারে, কিন্তু ওদের সঙ্গে তার প্রেম হতে পারে না, আর প্রেম না হলে শারীরিক মিলনের প্রশ্নই ওঠে না।

চাঁদু বা কুশ যদি কোনোদিন তার ওপর জোর করতে চায়, তা হলে দীপা সেদিনই খোকনকে নিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। বরানগরের বাড়িতে তার ঘর তো এখনও রয়েছে।

একদিন মর্নিং স্কুল থেকে বেরিয়েই দীপা দেখলো একটু দূরে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তার দাদা অমিতাভ সিগারেট টানছে। বিয়ের আগে দীপার গানের ইস্কুলের উল্টোদিকে মনীশ দাঁড়িয়ে থাকতো। এখন প্রেমিকের বদলে তার দাদা।

অমিতাভকে একবার দেখেই দীপা চোখ ঘুরিয়ে নিল। সে আর দাদার সঙ্গে জীবনে কোনোদিন কথা বলবে না ঠিক করে ফেলেছে। সে এসে দাঁড়ালো বাস স্ট্যান্ডে।

এই সময় তার পাশে উদয় হলো আর একজন মানুষ। রজত। ধপধপে সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবী পরা, নিখুঁতভাবে দাড়ি কামানো, রজত যেন একেবারে ভদ্রতার প্রতিমূর্তি। সে বিগলিতভাবে বললো, দীপা, তোমার দাদা তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা বলতে চান। একবার ওদিকে আসবে? একটা চায়ের দোকানে বসা যেতে পারে···

রজত দীপাকে কোনোদিন প্রেম নিবেদন করেনি, কিন্তু পরোক্ষে সে দীপাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল একসময়। মনীশের সঙ্গেও তার পরিচয় ছিল, কিন্তু মনীশের মৃত্যুর পর সে একবারও যায়নি দীপার খোঁজ নিতে। আজ সে এখানে এসেছে তার দাদার হয়ে দালালী করতে। তক্ষুনি দীপা তার মন থেকে রজতের নামটা মুছে ফেললো। এরপর রজতের সঙ্গে দেখা হলেও দীপা আর কথা বলবে না।

দীপা জানে, তার দাদা অমিতাভ যখন বরানগর থেকে এতদূর এসেছে, তখন সে দীপার সঙ্গে কথা না বলে ফিরবে না। অমিতাভ আত্মম্ভরী, দীপা মিনিবাসে উঠলে অমিতাভ ট্যাক্সি নিয়ে তাকে অনুসরণ করবে।

রাস্তা পেরিয়ে এসে দীপা অমিতাভর সামনে দাঁড়ালো মুখ নিচু করে।

অমিতাভ বললো, খুকী, তোর সঙ্গে কয়েকটা খুব জরুরি কথা আছে। চল, একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসি।

মুখ না তুলে মৃদু গলায় দীপা বললো, তুমি একদিন আমার বাড়িতে গিয়ে চা খেতে চাওনি। তোমার সঙ্গে আমার চা খাওয়ার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে, দাদা। কী বলবে, তুমি এখানেই বলো।

অমিতাভ ধমক দিয়ে বললো, তুই চা খেতে না চাস, আমরা খাবো। তুই কোল্ড ড্রিংকস নিতে পারিস। এখানে সব কথা বলা যাবে না।

দু'পা দূরেই একটা দোকান। এখানে গোটা তিনেক পর্দা ফেলা ক্যাবিনও আছে। দুপুরের দিকে অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েরা এখানে প্রেম করতে আসে। এখন বেলা সাড়ে দশটা, এখন সব কটাই ফাঁকা।

একটা ক্যাবিনে ওরা বসলো।

অমিতাভ বেয়ারাকে ডাকবার আগে দীপাকে জিজ্ঞেস করলো, তোর খিদে পেয়েছে, কিছু খাবি?

দীপা বললো, শুধু এক গেলাস জল। তোমরা যা ইচ্ছে খেতে পারো। কাজের কথা বলো।

—শোন, মা বলে পাঠিয়েছেন, বরানগরের বাড়িতে তোর জন্য একটা ঘর রাখা আছে। তুই ছেলেকে নিয়ে সেখানে একবারও থাকতে এলি না?

দীপা হাত বাড়িয়ে বললো, দাও!

একটু হকচকিয়ে গিয়ে অমিতাভ বললো, কী দেবো?

—সেই ঘরের চাবি। আমার যেদিন ইচ্ছে হবে গিয়ে থাকবো।

—চাবি তো মায়ের কাছে আছে, তুই গেলেই পাবি।

রজত বললো, দীপা, তোমার বাপের বাড়িতে তুমি যখন খুশী যাবে, চাবির কী দরকার? তোমার মা বলেছেন···

রজতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দীপা অমিতাভর দিকে সোজাসুজি চেয়ে বললো, আর কী কথা?

—আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি কয়েকটা নতুন রাস্তা বানাচ্ছে, কাগজে পড়েছিস? তার মধ্যে একটা রাস্তা যাবে আমাদের বাড়ির ঠিক পাশ দিয়ে। আমাদের পেছনের জমিটা রিকুইজিশন করে নেবে, এখুনি যদি বিক্রি করতে না পারি···

সবটা শোনার পর দীপা বললো, বেশ তো, বিক্রি করে দাও!

—তোর একটা সই লাগবে!

—দেবো সই করে!

—দিবি? আমি কাগজ-টাগজ রেডি করে এনেছি।

—হ্যাঁ, দেবো না কেন ? আমার শেয়ারটা দিয়ে দিও।

অমিতাভ এবার সাড়ম্বরে একটুখানি উঠে দাঁড়িয়ে তার প্যান্টের পকেট থেকে একটা খাম বার করলো। সেটা দীপার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, তোর এখন টাকা-পয়সার টানাটানি তা জানি, শুনে দ্যাখ, এর মধ্যে আড়াই হাজার টাকা আছে। মা এটা তোর জন্য পাঠিয়েছেন।

টাকাটা ছুঁলো না দীপা। টেবিলের ওপর পাতা অয়েল ক্লথে নোখ দিয়ে দাগ কাটতে লাগলো অন্যমনস্কভাবে।

—টাকাটা রাখ তোর কাছে, খুকী। তারপর এই কাগজটায় একটা সই।

—দাদা, আমার টাকার দরকার আছে ঠিকই। কিন্তু তোমার বা মায়ের কাছ থেকে কোনো দান আমি নেবো না। জমিটা কত টাকায় বিক্রি করছো ?

—তা এখনও ঠিক হয়নি, দু'একটা পার্টি ঘুরছে বটে...

—পাঁচ কাঠা জমি আছে, তাই না ? ওদিকে এখন জমির দাম কত ?

—শোন খুকী, আমি একটা নতুন ব্যবসায় নামছি, আমার এখন অনেক কাজ। বেশিক্ষণ বসতে পারবো না। তুই কাগজটায় তাড়াতাড়ি সই করে দে, আজ বিকেলেই একটা পার্টি আসবে।

দীপা মুখ তুলে কঠিন গলায় বললো, দাঁড়াও, আগে কথা ঠিক হোক। আমাদের যাদবপুরেই জমির দাম পঁচিশ-তিরিশ হাজার কাঠা হয়েছে শুনতে পাই। বরানগরে কুড়ি হাজার অন্তত হবে নিশ্চয়ই। তার মানে এক লাখ টাকা... মা, তুমি আর আমি, এই তিনজন অংশীদার। তিন ভাগের এক ভাগ... তার মানে তেত্রিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ টাকা পেলেই আমি তোমার ঐ দলিলে সই দিতে রাজি আছি।

অমিতাভ টেবিলটা চেপে ধরে প্রায় উল্টে দেবার ভঙ্গি করে বললো, তুই কি পাগলের মতন কথা বলছিস ? তুই আমার সঙ্গে দরাদরি করতে এসেছিস ? আমি তোকে ভালো মনে যা দিচ্ছি—

—আমি তোমার দান চাই না। আমি আমার বাবার সম্পত্তির ভাগ চাই।

—বাবার সম্পত্তি ? বাবা বেঁচে থাকলে পুরো সম্পত্তি আমার নামেই লিখে দিতেন... আমার ব্যবসার প্রয়োজনে আমার বাবার টাকা... তুই যা কীর্তি করেছিস, বাবা বেঁচে থাকলে কোনোদিন তোর মুখও দর্শন করতেন না।

—বাবা আমাকে তোমার চেয়ে কম ভালোবাসতেন না। জাত-টাত নিয়ে বাবার কোনো গোঁড়ামি ছিল না। বাবা একবার তাঁর এক মুসলমান বন্ধুর বাড়িতে আমাকে নিয়ে গিয়ে...

—বাবা যদি দেখতেন, তুই দু'দুটো ছেলের সঙ্গে—

রজত তার বন্ধুর হাত চেপে ধরে বললো, মাথা গরম করো না, অমিতাভ। কাজের কথা বলতে এসেছো...

দীপা বললো, তেত্রিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ টাকার এক পয়সা কম পেলে আমি ঐ কাগজে সই করবো না।

টেবিলের ওপরের খামটা থাবা মেরে তুলে নিয়ে অমিতাভ হুংকার দিয়ে বললো, আমি তোকে এক পয়সা দেবো না ! আমি মাকে আগেই বলেছিলাম।

—ঠিক আছে, দিও না। ঐ জমিও আমি বিক্রি করতে দেবো না।

—আলবাৎ বিক্রি করবো। তুই কী করে আটকাবি ? মামলা করবি ? দরকার হলে আমি হাইকোর্টে যাবো, দেখি তোর কত মুরোদ—

—আমি মিউটেশান অফিসে চিঠি লিখে জানিয়ে রাখবো যে ঐ জমির মালিকানায় আমার স্বত্ব আছে।

রাগ সামলাতে পারলো না অমিতাভ, ঝট করে সে এক চড় কষালো দীপার গালে। বরাবরই তার এরকম মাথা-গরম স্বভাব।

রজত তাকে আঁকড়ে ধরে বললো, আরে ছি ছি, এ কী করছো ?

বাচ্চা বয়েসে দাদার হাতে বেশ কয়েকবার চড়-চাপড় পেয়েছে দীপা। সে দুরন্ত মেয়ে ছিল। ছাদের পাঁচিলের ওপর দিয়ে ব্যালান্স করে হাঁটতো, বাবা তাকে প্রশ্রয় দিলেও দাদা শাসন করতো মাঝে মাঝে। আবার অমিতাভ চকলেটও কিনে দিত তাকে, বই কেনার পয়সা দিত, স্নেহের অভাব ছিল না তার।

সেইসব দিন কোথায় চলে গেছে !

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো দীপা। দাদা তাকে চড় মেরেছে বলে তার রাগ হয়নি। কিন্তু সে দাবি ছাড়বে না।

প্রতিটি শব্দের ওপর জোর দিয়ে সে বললো, আমি যদি একটাও পয়সা না পাই, তাও ঠিক আছে, তবু ঐ জমি আমি তোমাদের বিক্রি করতে দেবো না। তোমরা আমার স্বামীকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করোনি, তুমি আমার নামে যে-সব খারাপ কথা বলেছো, তার আমি শোধ নেবোই ! বাবার সম্পত্তির সাকসেশান সার্টিফিকেটে আমার নাম আছে, আমি যে আমার বাবার মেয়ে, সে পরিচয়টা তোমরা হাজার চেষ্টা করেও মুছে ফেলতে পারবে না ! তোমরা বলতে না, আমি আমার বাবার মতন জেদী ?

রজত বললো, শোনো দীপা, একটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ যদি আসা

যায়—

দীপা আর রজতের কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করলো না, বেরিয়ে গেল এক দৌড়ে। বাসে উঠলো না, প্রায় দৌড়তে দৌড়তেই সে বাড়ি ফিরলো, তার দু' চোখ দিয়ে জল ঝরছে। রাস্তার লোক ভাবছে একটি পাগলিনী!

বাড়ির মধ্যে ঢুকে সে ডুকরে কেঁদে উঠলো। সে আর নিজেকে সামলাতে পারছে না। তার অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে মনীশের জন্য। এ সময় মনীশ তার পাশে থাকলে সে সব সহ্য করতে পারতো. মনীশ বলেছিল, দীপা, তোমাদের ঐ বরানগরের বিষয় সম্পত্তির ওপর লোভ করো না, ওসব ওদের দিয়ে দাও, আমি যা রোজগার করি, তাতেই আমাদের কোনোক্রমে চলে যাবে। মনীশ বেঁচে থাকলে দীপা সব ছেড়ে দিত, কিন্তু মনীশ কেন চলে গেল?

চাঁদু বাড়িতে নেই, কুশ রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দারুণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমার কী হয়েছে, বৌদি? রাস্তায় কেউ কিছু বলেছে? কোন শুয়ারের বাচ্চা—

কুশের কাঁধ ধরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে দীপা বললো, কুশ, কুশ, আমি যদি খুব বিপদে পড়ি, তোমরা আমাকে ছেড়ে যেও না, আমাকে ছেড়ে যেও না!

এরপর কয়েকদিন খুব সাবধানে স্কুলে যাতায়াত করলো দীপা। কুশ আর চাঁদুকে সে সব কথা খুলে বলেনি, কিন্তু তার আশঙ্কা হচ্ছিল, অমিতাভ হয়তো জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সই আদায়ের চেষ্টা করবে। অবশ্য, তার সহোদর দাদা এতটা নীচে নামবে, একথা তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু বিষয় সম্পত্তির জন্য মানুষ এক একসময় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তার মায়েরও কি আর একটুও টান নেই দীপা সম্পর্কে? দাদা-বৌদির কোনো কথায় প্রতিবাদ করার সাহস পান না মা।

স্কুল থেকে ফেরার সময় অন্য টিচারদের সঙ্গে এক বাসে ফেরে দীপা, রাস্তার এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টিতে তাকায়। সে রকম কিছু ঘটলো না, অমিতাভর আর কোনো সাড়া শব্দ নেই।

পরের মাসে তাদের রোজগার হঠাৎ খুব কমে গেল। বর্ষা নেমেছে, তাদের গলিটায় যখন তখন জল জমে, এর মধ্যে ছোট ছেলেমেয়েরা আর গান শিখতে আসে না। গলির মুখের বড় রাস্তাটাও কী কারণে যেন খোঁড়াখুঁড়ি হচ্ছে, জল-কাদায় একেবারে বীভৎস অবস্থা। ছাত্রছাত্রী কমতে কমতে শূন্য হয়ে গেল, এখন চাঁদুই শুধু হারমোনিয়াম বাজিয়ে গলা সাধে। অনীতার ননদকে দুশো টাকা দিয়ে ঐ হারমোনিয়ামটার মালিক এখন দীপা।

মাসের শেষে অসুখে পড়লো খোকন। দু'দিনের রক্তআমাশায় নাভিশ্বাস উঠে গেল তার। এই সময় হাতে একদম পয়সা থাকে না। অনীতা আর তার স্বামী দিল্লি গেছে, একমাত্র ওদের কাছেই দীপা টাকা ধার করতে পারে। চাঁদু আর কুশ কোথা থেকে দু'তিনশো টাকা জোগাড় করে আনলো কে জানে, খোকনের অসুখে দীপা প্রায় পাগলের মতন হয়ে গেল, খোকনকে যদি না বাঁচানো যায়, তাহলে দীপা নিজেও আর বাঁচবে না। কুশ আর চাঁদুই ডেকে নিয়ে এলো বড় ডাক্তার, সাত দিনের মাথায় খোকনের সঙ্কট কেটে গেল।

বাচ্চাদের যেন হঠাৎ খুব কঠিন অসুখ হয়, আবার সারতে শুরু করলে সেরেও যায় খুব তাড়াতাড়ি। দশ দিনের মাথায় খোকন যখন টনটনে পায় দৌড়োদৌড়ি শুরু করলো, তখন তা দেখে দীপার মনে হলো আগের দশ দিনটা যেন বাস্তব নয়, দুঃস্বপ্ন। যেন কিছুই ঘটেনি।

দু' চারদিন মাত্র হাসি-খুশীতে কাটানোর পর চাঁদু পড়লো জ্বরে। শীতের কাঁপুনি দেখে মনে হলো ম্যালেরিয়া, পাড়ার ডাক্তারও বলে গেল সেই কথা।

ম্যালেরিয়ার ওষুধে কিন্তু কমলো না চাঁদুর জ্বর। চারদিন বাদেই তার টেম্পারেচার উঠে গেল সাড়ে পাঁচ, প্রলাপ বকতে লাগলো সে। পাড়ার ডাক্তার আবার এসে দেখে মুখ কালো করে বললো, মনে হচ্ছে ম্যালিগন্যান্ট, ব্লাড টেস্ট করাতে হবে, বাড়িতে কি চিকিৎসা করাতে পারবেন? হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন বরং, অবশ্য হাসপাতালেও জায়গা পাওয়া খুব শক্ত।

সেই জ্বরের ঘোরেও চাঁদু দীপার উরু আঁকড়ে ধরে বললো, বৌদি, আমি হাসপাতালে যাবো না!

দীপা তাকিয়ে দেখলো, কুশের মুখেও কালো ছায়া। সব গ্রামের ছেলেরাই হাসপাতালকে ভয় পায়। হাসপাতালে দিতে গেলে চাঁদু ভাববে, তাকে মরতে পাঠানো হচ্ছে। হাসপাতালগুলোর অবস্থাও দীপা কিছুটা জানে। গরিব লোকদের ওরা মাটিতে শুইয়ে রাখে।

দীপার ঘরের পাখাটা বিক্রি করে দেওয়া হলো। কত লোক তো পাখা ছাড়া বাড়িতে থাকে। তাছাড়া এখন বর্ষা পড়ে গেছে, আর অত গরম নেই। খোকন সদ্য অসুখ থেকে উঠেছে, তাকে একবেলা অন্তত দুধ খাওয়ানো দরকার। মনীশের প্রভিডেন্ট ফান্ডের সব টাকা খরচ হয়ে গেছে এর মধ্যেই। সুরঞ্জনের বইয়ের দোকান নিয়ে মামলা হচ্ছে তার পার্টনারের সঙ্গে, সুরঞ্জন নিজেই খুব ব্যতিব্যস্ত, তার কাছে টাকা চাওয়া যায় না।

অতবড় জোয়ান ছেলে চাঁদু, সাতদিনে কঙ্কালসার হয়ে গেল, চিঁচিঁ করা গলায়

সে দীপাকে বললো, বৌদি, আমি আর বাঁচবো না, তোমরা আমার জন্য আর কত খরচ করবে, আমাকে গ্রামে পাঠিয়ে দাও।

দীপা বললো, ছিঃ, ও কথা বলে না। তোমাকে বাঁচতেই হবে চাঁদু।

কুশ একেবারে দিশেহারা হয়ে গেছে, তার মুখ দিয়ে কোনো কথা ফোটে না। এমনিতেই যে সংসারটা চলছিল জোড়াতালি দিয়ে, এক একটা অসুখ এসে সেখানে ধস্ নামিয়ে দেয়। অসুখ তো কোনো হিসেবের মধ্যে পড়ে না।

এক দুপুরবেলা চাঁদু আবার প্রলাপ বকতে শুরু করে দিল। তার চোখ খোলা, তবু সে দীপা কিংবা কুশকে দেখতে পাচ্ছে না। ওপরের দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগলো, মা, মা, আমাকে কাছে নাও মা, বড় কষ্ট, আর, মনীশদা, আমি আসছি, আমি আসছি, আমি তোমার অধম ভাই, কোনো সেবা করতে পারিনি, ক্ষমা করো গো, ওগো তোমরা আমাকে ক্ষমা করো, ওরে খোকন, তুই দুধ খাবি না, দুধ খা, আমার ওষুধ খাবার দরকার নেই রে, খোকন···

খাটের দু' পাশে বসে আছে দীপা আর কুশ। সকালবেলা একজন ডাক্তার এসেছিলেন, তাঁকে পুরো ফি দেওয়া যায়নি, তিনি অপ্রসন্ন মুখে চলে গেছেন। তিনি দামি দামি ওষুধ লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন, তার মধ্য থেকে মাত্র দুটি ওষুধ আনতে পেরেছে কুশ। বাড়িতে আর একটাও পয়সা নেই। রেশান তোলা হয়নি বলে আজ ভাতও রান্না হয়নি।

ডাক্তারকে আবার ডাকা দরকার। কিন্তু পয়সা না পেলে তিনি নানান ছুতো দেখিয়ে এড়িয়ে যাবেন।

দীপার একবার মনে পড়লো বরানগরের বাড়ির কথা। দাদার কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকাটা পেলেও এ যাত্রাটা সামলানো যায়। মা একটা গয়না দেবেন বলেছিলেন···

দীপার মুখখানা কঠিন হয়ে গেল। আত্মসম্মানটুকুও চলে গেলে মানুষের জীবনের আর রইলো কী ? বেঁচে থাকাটাই বড় কথা, কিন্তু সেই বাঁচারও তো একটা মর্যাদা থাকা চাই।

সে বললো, কুশ, হারমোনিয়ামটা বিক্রি করে দিয়ে এসো।

কুশ বললো, বৌদি, হারমোনিয়াম··· ওতে আর কত—

দীপা দৃঢ় ভাবে বললো, পদ্মশ্রী হলের কাছেই একটা দোকান আছে, ওখানে নিয়ে যাও, দেড়শো-দুশো যা দেয়, নিয়ে এসো। ফেরার পথে ডাক্তার নিয়ে আসবে।

হারমোনিয়ামটা ঘাড়ে নিয়ে কুশ চলে গেল। চাঁদুর প্রলাপ বকা স্তিমিত হয়ে

এসেছে।

দীপা ঝুঁকে পড়ে চাঁদুর বুকে হাত বোলাতে বোলাতে বলতে লাগলো, চাঁদু, চোখ মেলে চাও, এই যে, আমি বৌদি, এখানে, সব ঠিক হয়ে যাবে চাঁদু···

তার উষ্ণ চোখের জল টপটপ করে পড়ছে চাঁদুর খোলা বুকে।

চাঁদু তার একটা দুর্বল হাত তুলে দীপার গালটা ছুঁয়ে বললো, বৌদি, তুমি আমায় এত ভালোবাসো···আমি এত অধম !

দীপা তার গালটা চাঁদুর গালের ওপর রেখে বললো, আমরা সবাই তোমায় ভালোবাসি, চাঁদু, তোমায় বাঁচতে হবে, মনের জোর আনো চাঁদু, বাঁচতেই হবে তোমাকে···

—